সম্পাদনা

ডঃ বারিদবরণ ঘোষ

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

সূচী

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে গল্পসংকলনের অভাব নেই। কোনো বিশেষ লেখকের অন্য-নির্বাচিত বা স্বনির্বাচিত, বিশেষ লেখক-গোষ্ঠীর সম্পাদক নির্বাচিত অথবা স্বল্প পরিচিত বা অপরিচিত লেখকদের গল্প সংকলনের ভিড়ে আমরা পুনশ্চ আরও একটি সংকলন পাঠকদের দরবারে হাজির করতে উদ্যত হয়েছি। কেন হয়েছি—এই প্রশ্নের জবাবদিহি করতেও আমরা প্রস্তুত কারণ আমাদের প্রবল ভরসা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের হাতেই যে বাংলা ছোটগল্পের জন্ম এবং যৌবনপ্রাপ্তি—এই মন্তব্য এখন প্রতিষ্ঠিত সংবাদে পরিণত হয়ে গেছে, এ নিয়ে নতুন চমক আর সৃষ্টি করা যায় না, যাবে না। কিন্তু একথাও অবিসম্বাদীভাবে সত্য যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছোটগল্পও তাঁর কাছ থেকে নানা অনুপ্রেরণা পেয়েই বিশ্ব সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর কালের একজন শ্রেষ্ঠ পাঠকও। পাঠক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় উদ্ঘাটন করা এই ভূমিকার আদৌ কোনো উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাঁর পঠনশীলতা বাংলা ছোটগল্পকারদের যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছে সন্দেহ নেই। 'তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি শরৎবাবু'—একথা লিখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের লেখকদের পরিতুষ্ট করেন নি। তার সঙ্গে আরও বলেছিলেন—'তোমাকে দোহাই দিই, একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।' এ তো শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লেখা। মাঝারি পরিচিত 'চারুচন্দ্র দত্ত প্রিয়বরেষু'কে লিখেছিলেন—'তোমার যে পরিচয় মুখ্য সে তোমার আলাপ পরিচয়ে। তুমি গল্প জমাতে পার।…গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না, এই তোমার বাহাদুরি।' আবার তাঁর প্রিয় বুদ্ধদেব বসুর 'বাসরঘর' পড়ে অক্লেশে লিখতে পেরেছিলেন—'এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বেগে বয়ে চলেছে।' অথবা তাঁর 'যেদিন ফুটলো কমল' সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন—'পড়তে পড়তে খট্‌কা লেগেছে পদে পদে তোমার ভাষায়। অনেক স্থানেই বাক্যের প্রণালী অত্যন্ত ইংরেজি।'

এমনতরো আরো কয়েকগুচ্ছ মন্তব্য ইতস্তত উদ্ধার করে আনতে পারি। বনফুলের 'কিছুক্ষণ' পড়ে 'খুবই ভালো' লাগার কথা; অন্নদাশঙ্করের 'রানী' পড়ে 'বিশেষ ভালো লাগা'র কথা। কিন্তু সে সবের দরকার কী! 'সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামত'—একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বিষয় হলেও এই ভূমিকা সে কথা আলোচনার স্থান নয়। কিন্তু এটাই

স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছি যে, এ হেন রবীন্দ্রনাথ যখন কারও গল্প সম্পর্কে বিশেষ করে সাধুবাদ করেন, এমনকি বহু গল্পের মধ্যে কোনো গল্পকে বেছে নিয়ে তাকে শিরোপা দেন—তখন সেটা না হয় চাটুকারিতা, না হয় অকারণ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলা। রবীন্দ্রনাথ কখনও যে বন্ধুকৃত্য করেন নি—এমন কথা ঘুণাক্ষরে আমরা বলতে চাইছি না, কিন্তু অকারণে প্রশংসা দ্বারা তিনি কারও সৃষ্টিশক্তিকে (?) বিড়ম্বিত করেছেন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ বহু বইয়ের সমালোচনা করেছেন, বহু লেখকের বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন—সর্বত্র তাঁর একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা যে শুধু লক্ষ্য করেছি তাই নয়। একটা গঠনাত্মক সমালোচনা দ্বারা লেখক এবং সমকালীন সাহিত্যকে সংগঠিতও করেছেন।

ভূমিকা পাঠকের কৌতূহল হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের কোন্ কোন্ লেখকদের সৃষ্টিকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। সে এক বিস্তৃত বিষয়। তবে পাঠকের এই কৌতূহলকে আমরা কিছুটা চরিতার্থ করতে পারবো এই সঙ্কলনের মাধ্যমে। কারণ এই গল্প সংকলনে মাত্র সেই গল্পগুলিই সংকলিত হয়েছে যাদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সপ্রশংস হয়েছিলেন এবং যেগুলি সম্পর্কে তাঁর লিখিত মন্তব্য নানা সূত্রে আমাদের করায়ত্ত হয়েছে। এর সংখ্যা প্রচুর হতে পারে নি। কারণ অনেক লেখকের গল্পাকৃতি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে মন্তব্য করলেও নির্দিষ্ট গল্প সম্পর্কে নির্দিষ্ট মতামত প্রকাশের সংখ্যা খুবই সীমিত। আমাদের সংকলিত গল্প সংখ্যার অতিরিক্ত ২।১ টি এমন গল্প যে রয়ে গেল তা নয়, তবে পুনর্মুদ্রণের অনুমতি এবং অন্যান্য সংশয়ের কারণে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। এজন্য পাঠকদের চেয়ে আমাদের আপশোসও কম নয়। বেশির ভাগ অনুমতিই পাওয়া গেছে, যা পাওয়া যায়নি তা আমরা অচিরাৎ পাবো—এমন আশাও করি—কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসিত গল্পগুলিকে পুনরায় পাঠকদের দরবারে উপস্থিত হতে দেখে তাঁরা রবীন্দ্রস্মরণে পুনর্বার পরিতৃপ্তি লাভ করবেন।

আমাদের গল্পসংকলনের উদ্দেশ্য আশাকরি এবার পাঠকদের কাছে কিছুটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। অজস্র বাংলা ছোটগল্পের মধ্যে বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা রবীন্দ্রনাথ যে গল্পগুলি আস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন—প্রশংসা মধ্যে সিঞ্চিত করেছিলেন—সেই গল্পগুলির রসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না। উল্লেখ করার মতো বিষয় যে, তাঁর ভালো লাগা গল্পগুলির রচয়িতারা সবাই বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করেননি, অথবা খ্যাতিমান গল্পকারদের সঙ্গে এখন তাঁদের আর মনে করা হয় না। কেউ কেউ আছেন—যাঁদের নাম এখনকার পাঠকদের পরিচিতও হয়ত নয়। অথচ কি প্রবল সামর্থ্যে তাঁরা ভরপুর ছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সামর্থ্যে অভিভূত হয়েছিলেন। আবার এমন লেখকেরাও এই তালিকায় রয়েছেন—যাঁরা খুবই

পরিচিত, এখনও অবধি যাঁদের কেউ কেউ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে বর্তমান। তাঁদের পরিচিত বা প্রায় বিস্মৃত গল্পও আমরা এখানে সংগ্রহ করে পাঠকদের কাছে পুনরায় উপস্থিত করেছি। রবীন্দ্রনাথের বেছে নেওয়া কয়েকটি গল্প একালের পাঠকের রুচির কাছে উপস্থিত করেছি এই ভরসায় যে তাতে রবীন্দ্রনাথের চিরকালীন রুচি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে এবং সবিস্ময়ে একালের পাঠক আপন রুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রুচির সাযুজ্য লক্ষ্য করে পুলকিত হবেন। পূর্বে এই ধরনের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে বাংলা কাব্য সংকলনপ্রকাশ করেছিলেন —আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমান সংকলনে সংকলিত গল্পগুলিও তিনি বেছে নিতেন যদি কোন গল্পসংকলনও তিনি প্রকাশে উদ্যোগী হতেন। তবে অনুমানকে আর এগোতে দিতে চাই না।

পাঠক স্বভাবতই এবারে জানতে চাইবেন,সংকলিত গল্পগুলি যে রবীন্দ্রনাথের ভাল লেগেছিল তার প্রমাণ পত্রাদি কই? আমরা প্রস্তুত আছি তাঁদের জিজ্ঞাসাকে চরিতার্থ করতে। সর্বত্রই যে অপরিমেয় প্রমাণ হাজির করতে পারবো এমন দলিলপত্র আমাদের নেই। তবে যা আছে তা দিয়েই পাঠকদের হয়তো তৃপ্ত করতে পারা যাবে। গল্পগুলি যেমন যেমন সংকলিত হয়েছে পর পর সেই রকম তথ্যাদি সন্নিবেশ করা যাচ্ছে। তবে এই সূত্রে বলি যাঁরা এই সংকলনে আমাকে সপ্রেমে আনুকূল্য করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীসুপ্রিয় সরকার, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীশরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতির নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। এমন একটি সংকলনের প্রস্তাব দেওয়া মাত্রই বন্ধুবর শ্রীসুনীল মণ্ডল যে লুফে নেবেন—তা আমার ধারণাই ছিল না। কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে তিনি এই প্রস্তাব অনুমোদন করে দ্রুত প্রকাশে তৎপর হলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিতে পারবো মা, কারণ অজস্র পাঠক তাঁকে অভিনন্দিত করবেন—সেটাইতাঁর প্রাপ্য বিষয় হবে।

এখন আমরা একাদিক্রমে গল্পগুলি যে রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল সে বিষয়ে কিছু তথ্য নিবেদন করি। প্রথম গল্পটির লেখক সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এঁর সম্পর্কে কোনো উল্লেখ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস-সম্পর্কিত কোনো বইয়েই নেই। অথচ এঁর গল্পটিকে আমরা আমাদের সংকলনের প্রথমেই স্থান দিয়েছি। সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত আরও ২/১টি গল্প লিখলেও তাঁর কোনো বইয়ের সন্ধানও আমরা এযাবৎ পাইনি। শুধু এটুকুমাত্র আমরা জানতে পারি যে এই গল্পটি যখন লেখা হয়, তখন লেখক কলকাতার এই ঠিকানায় বসবাস করতেন—৮নং বিন্দু পালিতের গলি, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। জোড়াসাঁকোয় থাকতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিনতেন-জানতেন —এমন তরল সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই আমরা কেউ করবো না।

এঁর একটি গল্প রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। শুধু ভালো লেগেছিল তাই নয় বহু শত গল্প থেকে বেছে এই গল্পটিকেই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ গল্প বলে নির্বাচন করে দিয়েছিলেন। পাঠকেরা অনেকেই জানেন যে কেশতৈল কুন্তলীন এবং গন্ধদ্রব্য দেলখোসের আবিষ্কার ও প্রচারক তাঁর বাণিজ্যকে সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে 'কুন্তলীন' পুরস্কার নামে একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করে প্রতি বছর পুজোর সময় তা গ্রাহকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। গল্পের মধ্যে কৌশলে কুন্তলীন বা দেলখোসের উল্লেখ করে। (যেন তা কোন ক্রমেই বিজ্ঞাপন না হয়) গল্প পাঠাবার আহ্বান জানিয়ে তিনি যে বিজ্ঞাপন দিতেন তাতে বহু শত গল্প লেখক সাড়া দিয়ে গল্প পাঠাতেন এইচ বসুর দপ্তরে। ১৩০৩ সাল থেকে এই ধরনের সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে। এসব গল্পগুলি মেলে ১০/১৫ টি নির্বাচিত করে দেওয়ার ভার দেওয়া হতো সেকালের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের। এমনি করেই শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প আত্মপ্রকাশ করে এই কুন্তলীন পুরস্কারেই। যাই হোক ১৩০৭ সালের পুরস্কারের জন্য আসা গল্পগুলি থেকে ১০টি গল্প বেছে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এর প্রথম গল্পটি 'আমার চাকরী' প্রকাশক ঘোষিত ২৫ টাকা পুরস্কার পায়। সেকালের তুলনায় যথেষ্ট মূল্যবান পুরস্কার। আসলে এই দশটি গল্পই রবীন্দ্রনাথের বাছাই করে দেওয়া গল্প। তার মধ্যে প্রথম গল্পটিই সেরা। সেজন্য সব গল্পগুলি না দিয়ে আমরা প্রথম গল্পটিই দিলাম। (কুন্তলীন পুরস্কারের গল্পগুলি একত্র করে মুদ্রিত হচ্ছে অন্যত্র—পাঠকের কাছে এ সংবাদও জানিয়ে রাখতে পারি)। গল্পগুলি যে রবীন্দ্রনাথেরই বেছে দেওয়া এ বিষয়ে প্রমাণপত্র হিসাবে আমরা প্রকাশক 'শ্রীএইচ বসু' লিখিত ১০ই আশ্বিন, ১৩০৮ তারিখে 'নিবেদনের' অংশ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে দিই—

> ১৩০৭ সনের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য প্রেরিত রচনার মধ্য হইতে যে কয়েকখানি রচনা পুরস্কৃত হইয়াছে তাহা মুদ্রিত হইল। এবার পুরস্কার-গুলি পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন ; এজন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।'

দ্বিতীয় গল্পের লেখিকা হেমলতা দেবী (ঠাকুর) পরিচিত জনেদের কাছে 'বড়মা' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। ঠাকুর পরিবারে তিনি এসেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের বধূ হিসাবে। রামমোহন রায়ের বংশজা এই মহৎ কন্যাটি পারিবারিক ক্ষেত্রে যে পরিমাণ গ্রহণীয় হয়েছিলেন সাহিত্যচর্চাতেও সেই পরিমাণ গ্রহণীয় হয়েছিলেন। কখনও তিনি সাহিত্যিক, কখনও সম্পাদিকা আবারও কখনও বা সংগীত রচয়িনী।

'জ্যোতিঃ' 'অকল্পিতা' ও 'আলোর পাখি' কাব্যত্রয়ের রচয়িত্রী হেমলতা তাঁর

থুল্লশ্বশুর রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর গল্পগুলি সেকালের পাঠক-পাঠিকা সহ রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস দৃষ্টি কেড়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর 'দুনিয়ার দেনা' গল্পের সাজি পড়ে ভারতবর্ষ পত্রিকা মন্তব্য করেছিল—'লেখিকা যেন এই একটি গ্রন্থেই দুনিয়ার দেনা শোধ না করেন।' হেমলতা দেবীর আরও একটি গল্পসংগ্রহ পুস্তকের নাম 'দেহলি'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ থেকে আশ্বিন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ। গল্পগুলি সংগৃহীত হয়ে প্রকাশের আগে লেখিকা রবীন্দ্রনাথকে পাণ্ডুলিপি দেখান। গল্পগুলি পড়ার পর উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ লেখিকাকে যে পত্র লেখেন তাকেই লেখিকা ভূমিকা-লিপি হিসেবে গ্রহণ করে বইটি প্রকাশ করেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি তাঁরই হস্তাক্ষরে ছাপিয়ে দিলাম।

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

তোমার ছোট গল্পগুলি পড়ে আমার খুব ভালো লাগল। স্ত্রীমনের চরিত্রের ও তার পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলা দেশের ছোট বড়ো নানা গ্রাম পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষ্যে তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে, তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্রপ্রদর্শনী। তোমার যে গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যিক গুণপনা বিশেষভাবে ফুটেছে তাদের সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য। ইতি ৮ চৈত্র ১৩৪৫

আশীর্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি কি পরিমাণ ভাল লেগেছিল। 'দেহলি' বইটিতে চলাচল, দশমিকা, নবমিকা, চন্দ্রমণি, হাটতলা, সুদর্শনের

সংসার এবং প্রসাদ—এই ছ'টি গল্প সংগৃহীত হয়ে আছে। এর মধ্যে প্রথম গল্প চলাচল আমরা সংকলিত করে দিলাম। এই প্রথম গল্প রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় ভাল লেগেছিল—তাছাড়া এই গল্পটিতেই হেমলতার সাহিত্যিক গুণপনা সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

রাজশেখর বসুর পরিচয় আজকের পাঠকদের কাছে নতুন করে দেওয়া বৃথা। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্প নিয়ে আবির্ভাবের মুহূর্তেই, তিনি সম্বর্ধিত হয়েছিলেন সমকালীন পাঠকদের দ্বারা। তাঁর 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ যে অনুকূল সমালোচনা করেন তাতে বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে বিচলিত করে। কারণ তিনি ভেবেছিলেন সাহিত্যের আকর্ষণে হয়তো তাঁর এই ম্যানেজারটি পদত্যাগ করেন। একটি চিঠিতে আচার্য রায় তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :
শ্রদ্ধাস্পদেষু

শেষ বয়সে আপনাকে লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম।...
সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'গড্ডলিকার প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য সম্রাট স্বয়ং তাহাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।... এখন তাঁহাদের মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈরী একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ কার্যে অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন "কেষ্ট-বিষ্টু", সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।...আসল কথা এই যে আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে আর একটি এমন তীব্র সমালোচনা করুন যে পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে?'...

রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে ১৮ অঘ্রাণ ১৩৩২ তারিখে যে চিঠি লেখেন, তার অংশ-বিশেষ উদ্ধার করি—...'আমারই পরে অভিযোগ যে, আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্র সন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত।... আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিকপত্র বলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত 'ভুশণ্ডীর মাঠে' তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন।...যাই হোক আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানষুটি একেবারেই কেমিক্যাল নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।'

এখন 'গড্ডলিকা' পড়ে প্রবাসী পত্রিকার কার্তিক ১৩৩২ সংখ্যায় (পৃ. ২১৫-১৬) যে অনুকূল মত প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিই। সব গল্পগুলিই তাঁর ভাল লেগেছিল। তবে 'ভুশণ্ডীর মাঠ' তার মনে বার বার উঁকি দিয়েছিল, তা মনে ভেবে নিতে আমাদের অসুবিধা হয়নি। 'বইখানির নাম "গড্ডলিকা"। ভয় ছিল, পাছে নামের সঙ্গে বইয়ের আত্মপরিচয়ের মিল থাকে,—কেন না সাহিত্যে গড্ডলিকা প্রবাহের অন্ত নাই। কিন্তু সহসা ইহার অসামান্যতা দেখিয়া চমক লাগিল। চমক লাগিবার হেতু এই যে এমন একখানি বই হাতে আসিলে মনে হয়, লেখকের সঙ্গে দীর্ঘকালের পরিচয় থাকা উচিত ছিল।...

'...বইখানি চরিত্র-চিত্রশালা। মূর্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙাচোরাই তার কাজ তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মতো হয়—ঠিকভাবে বুঝিয়া দেখিলে বুঝা যায়, গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের সুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কি না, সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগের চিরকাল জানি। এমন-কি তাঁহার ভুশণ্ডীর মাঠের প্রেতগুলোর ঠিকানা যেন আমার ভ্রমণ বিবরণের মধ্যে কোথাও লেখা আছে; এমন-কি যে পাঁঠাটা কন্সর্টওয়ালার ঢাকের চামড়া ও তাহার দশটাকার নোটগুলো চিবাইয়া খাইয়াছে, সেটাকে...দেখিয়াছি বলিয়া যেন স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।'...

এটা খুবই আক্ষেপের কথা যে রাখালচন্দ্র সেনের মতো একজন গল্পকার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেলেন না। জানি না একটি মাত্র গল্পগ্রন্থের লেখক—তাও আবার তাঁর অকালমৃত্যুর পর প্রকাশিত—বলেই কি অবহেলা। অথচ 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হলে একটা আলোড়ন পড়ে যেতো। অপরিজ্ঞাত এই লেখকের গল্প লেখায় যে কি আশ্চর্য নিপুণতা ছিল তা এই সংকলন পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে এতো বছর পরেও এই প্রতিভার মৃত্যুর জন্য খেদ প্রকাশ করবেন—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের ভাল লেগেছিল তাঁর গল্প। সেই সুযোগে এই বিস্মৃত লেখককে এতোগুলো বছর পর আবার একালের পাঠকদের কাছে সাহস ভরে উপস্থিত করলাম।

রাখালচন্দ্রের জীবনী তাঁর জীবনের মতই সংক্ষিপ্ত। ১৮৯৭ সালের চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করে মাত্র ৩৭ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনযাপন করে ১৯৩৪ সালে আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ থাকার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। খুলনা জেলার এই প্রতিভা দীপ্তোজ্জ্বল কর্মবহুল মানুষটি তীক্ষ্ণ মেধার দ্বারা বিদ্যালয় ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের এম. এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। সেই বছরই তিনি মনোনীত হন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য। দু বছর অক্সফোর্ডে কাটিয়ে এসে ১৯২১ সালে নিযুক্ত হন সরকারী কাজে। তারপর তের বছর যুক্তবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সসম্মানে অলঙ্কৃত করেন বিচারকের পদ।

এই কর্মজীবনের বাইরে তাঁর একটা সাহিত্যজীবন ছিল। গুটি সাতেক গল্প ও সামান্য অন্যধরনের রচনা তাঁর এই সাহিত্য জীবনের প্রকাশক হয়ে রয়েছে। সহযাত্রী, সারথি, পিঞ্জরে, অমন, পাঞ্চভৌতিক, পরশ পাথর এবং শেষ খেয়া—এই সাতটি গল্প তাঁর মৃত্যুর পর সংকলন করে 'সপ্তপর্ণ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ আশ্বিন ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে।

বইটি প্রকাশের পর এটি সম্পর্কে একটি মনোরম মতামত প্রকাশ করেন

ওঁ

সপ্তপর্ণীতে প্রকাশিত প্রথম গল্পটির নাম [struck out] সহযাত্রী। কিছুকাল পূর্বে এটি পড়েছিলুম পরিচয় পত্রে। এ জাতের গল্প আমাদের সাহিত্যে দেখি নি। কেবল যে বিষয়টি য়ুরোপীয় তা নয়, রসের উগ্রতা এবং আখ্যানের চমক লাগানো নাট্য বিকাশের মধ্যে য়ুরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। আরো একটা লক্ষ্য করেছিলুম যে হঠাৎ ঘটনার ধাক্কায়, অস্বাভাবিক অভিপ্রায় হতে যে একটি ঘটতে পারত তা এতে কিছু ঘটে নি। পরে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। লেখকের খবর নিতে গিয়ে জানলুম তিনি বাঙালি সিভিলিয়ান, য়ুরোপীয় আবহাওয়া তাঁর জানা আছে। কিন্তু জানা থাকলেই যে জানানো যায় তা নয়। তাঁর এই পাকা হাতের পরিচয় পেয়ে আশা করেছিলুম বাংলায় গল্প রচনায় নূতন পথযাত্রীর অভ্যুদয় হয়েছে। তার অল্পকাল পরেই তাঁর অকালমৃত্যুর সংবাদে হতাশ হয়েছিলুম। সপ্তপর্ণী বইখানিতে তাঁর লেখনীর আরো কিছু পরিচয় [struck out] রয়ে গেল। কিন্তু বেঁচে থাকলে যা আশা করা যেতে পারত তার থেকে বাংলা সাহিত্য বঞ্চিত হোলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী' পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪৫ সংখ্যায় (পৃ. ৪২৪)। সেটিই পরে 'সপ্তপর্ণ' (রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সপ্তপর্ণী') বইয়ের ভূমিকা বা শিরো-

ভূষণ হিসাবে মুদ্রিত হয়। আমরা কেন রাখালচন্দ্রের 'সহযাত্রী' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের ভালো-লাগা গল্প হিসাবে গ্রহণ করেছি—রবীন্দ্রনাথের সেই মতামতটি তাঁর হস্তাক্ষরে মুদ্রিত করে দিয়ে তার প্রমাণ দিলাম এ বিষয়ে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

জ্যোতির্মালা দেবীর নাম সাহিত্যের ইতিহাসে আছে বটে তবে তাঁর উপন্যাস গল্প নিয়ে বিশেষ আলোচনা দেখি না। এক আশ্চর্য জীবন যাপন করে এক দুঃখময় অবস্থার মধ্যে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সাতবেড়িয়া গ্রামে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বড় বংশের এই কন্যাটি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করার পর কমার্স ও জার্নালিজম পড়তে বিলাত যান। এক অসুখী দাম্পত্যজীবনের সূচনা ও অবসানের পর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরে আসেন।
ইংলণ্ডে থাকার সময়ই তিনি দিলীপকুমার রায়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং পরে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদধন্য হন। এখানে দ্বিতীয়বার আরেক অসুখী দাম্পত্যে জীবন বরণে বাধ্য হন এবং মাত্র তিন মাসের মধ্যে সেই জীবনেও ইতি ঘটে। ফলে মানসিক ভারসাম্য হারান এবং এক অবহেলিত অবস্থায় ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।
জ্যোতির্মালা দেবীর সাহিত্য জীবন সোনার ফলে পূর্ণ ছিল।
সন্ধানে, ইরাবতী, রক্তগোলাপ নামে তিনটি উপন্যাসের লেখিকা খ্যাত হয়েছিলেন 'বিলেত দেশটা মাটির' নামক গল্পসংকলনের জন্য। ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত এই বইটির নামকরণের পিছনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ঐ বিলেত দেশটা মাটির,/সেটা সোনারূপোর নয়,/তার আকাশেতে সূর্যি ওঠে,/আর ঐ মেঘে বৃষ্টি হয়' ইত্যাদি কবিতার প্রভাব আছে। শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দকে উৎসর্গীকৃত এই বইয়ের একটি দীর্ঘ পরিচিতি লিখে দিয়েছিলেন পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে দিলীপকুমার রায় এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখে দিয়েছিলেন একটি অনবদ্য ভূমিকা। বিদেশী ও দেশী—দুটি ভাগে ৬টি গল্প (সেটা সোনারূপোর নয়, নীলরক্ত, রাশিয়ান ক্যাট, অকারণ, পরিচয় ও ভাঙাগড়া) বইটিতে সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলি এবং লেখিকা সম্পর্কে মনোহর মতামত দিলেও রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল জ্যোতির্মালার 'রাশিয়ান ক্যাট' গল্পটি। তিনি স্পষ্টতঃ তাই লিখেছিলেন—"লেখিকার সম্বন্ধে আশ্বাসের কারণ রয়েছে তাঁর 'রাশিয়ান ক্যাট' গল্পটিতে। তার মধ্যে যে-বেদনা আছে তা অল্প দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করার মতো নয়, তার প্রাপ্তি স্বীকার করতেই হয়।'
আমরা একারণেই 'রাশিয়ান ক্যাট' গল্পটি এখানে সংকলন করে দিলাম। প্রসঙ্গত জ্যোতির্মালা দেবীর আসল নাম ছিল জ্যোতির্ময়ী। বিবাহ-পূর্ব পদবী ছিল

চৌধুরী। জ্যোতির্মালা তাঁর দ্বিতীয় নাম।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রায় সূচনাপর্বেই রবীন্দ্রনাথের প্রসন্নতা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর 'রাইকমল' গল্প কবির ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল 'জলসাঘরের' গল্পগুলিও। 'রাইকমল' পড়ে শান্তিনিকেতন থেকে ২৮ মাঘ ১৩৪৩ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে তারাশঙ্করকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'রাইকমল গল্পটির রচনায় রস আছে এবং জোর আছে—তাছাড়া এটি ষোলো আনা গল্প, এতে ভেজাল কিছু নেই।'

অন্যান্য গল্পও তাঁর ভাল লেগেছিল। তারাশঙ্করের মুন্সিয়ানা কবিকে মুগ্ধ করেছিল—'তোমার লেখা যতই পড়চি ততই বুঝচি তুমি একজন লিখিয়ে বটে তাতে সন্দেহ নেই। যে সব চরিত্র এঁকেছ তা সজীব হয়ে উঠেছে, তাদের নিয়ে যে খেলা খেলিয়েছ মনের মধ্যে সে ছাপ দিয়ে যায়, রেশ রাখে।'' আবার লিখে-ছিলেন—'গল্প লেখায় তুমি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অগ্রণীদের মধ্যে। তোমার লেখা আমার বিশেষ ভালো লাগে সেকথা তুমি জানো।' (২৭.১.৩৯) এসব মন্তব্য প্রধানত তারাশঙ্করের 'ছলনাময়ী' বা 'রসকলি' গল্প সম্পর্কে। শেষ বইটি তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। 'রাইকমল' একটি বড় গল্প, প্রায় উপন্যাসকল্প। ইচ্ছে থাকলেও নানাকারণে এটিকে আমাদের সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা গেল না।

আমরা গ্রহণ করেছি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম গল্পগ্রন্থ 'জলসাঘর' এর প্রথম গল্প 'রায়-বাড়ি'। 'রায় বাড়ি' তারাশঙ্করের অন্যতম প্রিয় গল্পও। 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশন সংস্থা থেকে যখন তিনি তাঁর 'প্রিয়গল্প' সংকলনটি প্রকাশ করেন তখন এটিকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন এবং স্বরচিত ভূমিকায় এটিকে 'প্রিয় গল্প' বলেই ঘোষণা করেন।

এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের খুবই ভাল লেগেছিল। এবিষয়ে তারাশঙ্করের নিজের সাক্ষ্য উদ্ধার করি। 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থের ১৪৯ পৃষ্ঠায় (২য় সংস্করণ ১৩৬৪, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড) তিনি এ বিষয়ে প্রথমে লিখে-ছেন—"সেবার পুজোর সময় যে ক'টি গল্প লিখেছিলাম, তার মধ্যে "রায় বাড়ি" গল্পটি অন্যতম। "রায় বাড়ি" গল্পটি আমার খুব প্রিয় গল্প।" পরে ঐ গ্রন্থেরই ১৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় আরও বিশালভাবে লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে কলকাতায় এলেন। আমি একদিন 'জলসাঘর' হাতে নিয়ে বিচিত্রাভবনে উপস্থিত হলাম। তাঁকে প্রণাম করে বইখানি তাঁর হাতে" তারাশঙ্কর দিয়ে আসেন। কদিন পরে 'তাঁর কাছে যাঁরা যাওয়া-আসা করলেন, তাঁদের কাছে জলসাঘরে'র প্রশংসার কথা শুনলাম। কলকাতায় নৃত্যনাট্যের পর্ব শেষ করে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। ফেরার পথে তাঁর হাতে নাকি 'জলসাঘর' বইখানি ছিল। ট্রেনেই তিনি ইরিসিপ্লাসের আক্রমণে প্রাণ হারান

বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন চেতনাহীন অবস্থা তাঁর।" এই সংবাদে দেশব্যাপী উদ্বেগের ছায়া পড়ে। শেষে সংবাদপত্রে কবির সুস্থতার সংবাদ প্রকাশিত হলে সকলের স্বস্তি লাভ ঘটে। তারাশঙ্কর লিখেছেন—'এ সংবাদ যেদিন কাগজে বের হল, ঠিক তার তৃতীয় দিনে দুখানি পত্র পেলাম শান্তিনিকেতন থেকে। একখানি লিখেছেন সুধীর কর—কবির প্রাইভেট সেক্রেটারি,...সুধীর কর লিখেছেন,—তারাশঙ্করবাবু, পত্রপাঠ যদি একখানি 'জলসাঘর' কবিকে যেভাবে লিখে দিয়েছিলেন তেমনি লিখে পাঠিয়ে দেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হব। গুরুদেবকে যে বইখানি দিয়েছিলেন সেখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"...

অন্য চিঠিখানি তারাশঙ্করকে লিখেছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিপুত্রের চিঠিটি ছিল সংক্ষিপ্ত—শুধু বই পাঠাবার অনুরোধ। আসলে চেতনা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 'জলসাঘরের খোঁজ করেন। না পেয়ে রাগারাগি করতে পারেন ভেবে পুনরায় বই পাঠাবার জন্য এই অনুরোধ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মন এর গল্পে আকর্ষিত হয়েছিল।

"পরে সুধীর করই আমাকে জানিয়েছিলেন। চেতনা ফিরে পেয়ে কবি চেয়েছিলেন তাঁর বিজ্ঞানের বইয়ের প্রুফ আর চেয়েছিলেন 'জলসাঘর' বইখানি। ওই "রায় বাড়ি" গল্পে গেরুয়া পরে সর্বস্ব ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে গঙ্গার ঘাটে নৌকায় উঠতে গিয়ে বিশ্বম্ভর রায় বারেক ফিরে তাকিয়ে যে দেখলেন, অন্ধকার রায়বাড়ির জলসাঘরে আবার জ্বলে উঠেছে আধ-নেবানো বাতিগুলি এবং সেই আকর্ষণে যে আবার তিনি ফিরে এলেন, এরই মধ্যে অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তির মধ্যে তাঁর নিজের ফিরে আসার একটি মিল পেয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে।

"শ্রীসুধীর কর লিখেছেন, গুরুদেব কোন খ্যাতনামা কবিকে আপনার সম্পর্কে একখানি মূল্যবান পত্র লিখেছেন।...যাঁকে লিখেছেন তিনি খুব সম্ভব সুরেন্দ্র মৈত্র মহাশয়।...

"এই কারণেই 'জলসাঘরের "রায় বাড়ি" আমার খুব প্রিয় গল্প।"

'জলসাঘর' প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে। কবি কলকাতায়, ভাদ্র মাসে এসে 'এম্পায়ার' ও 'ছায়া' রঙ্গমঞ্চে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব মঞ্চস্থ করলেন। এখান থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার পথে তিনি অজ্ঞান হন। পরে ভাল হয়ে ফিরে এলে বিজ্ঞানের যে বইয়ের প্রুফ চান—সেটি ছিল যন্ত্রস্থ 'বিশ্বপরিচয়' বইটি। তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতি কথায় রায়বাড়ি গল্পটি রবীন্দ্রনাথের ভাল লেগেছিল সুধীর কর ওঅন্যান্যদের কাছে সে কথা শুনে কেন ভাল লেগেছিল তা জানাতে গিয়ে ভুলক্রমে এই গল্পের প্রধান চরিত্র রাবণেশ্বর রায়কে বিশ্বম্ভর রায় লিখেছিলেন।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার আশ্চর্য সমাপতন লক্ষ্য করে 'রায়বাড়ি' গল্পটি কিভাবে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় প্রবিষ্ট হয়েছিল অগোণে তার একটি সম্ভাব্য যোগাযোগ নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর সম্পাদিত 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' সংকলন গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা। "রায়বাড়ি গল্পে ঐ গল্পের শেষাংশের সঙ্গে কবির প্রান্তিক কাব্য গ্রন্থের ৬ সংখ্যক কবিতার আশ্চর্য মিল দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। কবি সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন ২৫ ভাদ্র। ২৭ ভাদ্র সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। প্রায় দু সপ্তাহ পর থেকে কবি আশ্বিন মাসে পর পর আটটি কবিতা লিখলেন। অন্যান্য দশটি কবিতার সঙ্গে সেগুলি একত্র সংকলিত আছে 'প্রান্তিকে'।" জগদীশবাবু যে কবিতাটি ইঙ্গিত করেছেন সেটি ৪ অক্টোবর ১৯৩৭ তারিখে লেখা 'প্রান্তিক' এর ৬ সংখ্যক কবিতা। পাঠকদের সুবিধার জন্য কবিতাটির অংশবিশেষ বয়ন করে দিলাম।

মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে
নহে কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম অস্বীকারে।...
সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন লুকায়েছে তৃণতলে
সর্ব আবর্জনাত্রাসী বিরাট ধূলায়, জপমন্ত্র
মিলে গেছে পতঙ্গ গুঞ্জনে।...

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।
জীবনের শেষ পাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে যথা মেঘের অঞ্জলি
পূর্ণ করি দেয় সন্ধ্যা, দান করি চরম আলোর
অজস্র ঐশ্বর্যরাশি সমুজ্জ্বল সহস্র রশ্মির—
সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি ঘোষণার আগে।

আমরা আমাদের গল্পক্রমকে লেখকদের আবির্ভাব কালক্রমে সাজিয়েছি সেদিক থেকে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে একেবারে শেষ স্থান দেওয়া উচিত হয়েছে কিনা—এ সন্দেহ একাধিকবার আমার মনে দেখা দিয়েছে। তবে ভরসা স্বয়ং শ্রীমিত্র নিজে তিনি তাঁর জন্মবর্ষকে ১৯০২ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে স্থাপন করেছেন—তাঁর সঠিক জন্মবর্ষ তাঁরই জানা নেই। তাছাড়া সংকলিত গল্পগুলির মধ্যে, আমাদের অশেষ সৌজন্যক্রমে তিনিই একমাত্র গল্পকার যিনি আমাদের মধ্যে বর্তমান। সেকারণেই তাঁর গল্পটিকে দিয়েই আমাদের আনন্দ-রঙের শেষ মিলন স্থানটি

টেনেছি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, বলাবাহুল্য জীবিত প্রবীণ গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর প্রথম দিকের একটি গল্পগ্রন্থ 'ধুলিধুসর' প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। প্রকাশের পর একটি বই তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে চিঠি লেখেন তা থেকে বইটির গল্পগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লিখিত অভিমত যেমন পাওয়া তেমনি বিশেষ করে বইটির প্রথম গল্পটি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ ভাল লাগার কথা জানতে পারা যায়। এই প্রথম গল্পটিই হল—একটি রাত্রি। শ্রীমিত্রের অশেষ সৌজন্যে গল্পটি এখানে সংকলিত হল—বর্তমানে প্রচারিত তাঁর কোনো গল্প-সংকলনে এই গল্পটি সংকলিত হয় নি। আমরা এখন রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি সমগ্রত উল্লেখ করি ঃ

প্রেমেন্দ্র মিত্র
C/o মিত্র এণ্ড ঘোষ
১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এর আগে মাঝে মাঝে তোমার লেখা কবিতা পড়েছি। তাতে স্বকীয় বিশিষ্টতায় আমাকে আনন্দ দিয়েছে। কখনো তোমার গল্প পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। তোমার 'ধুলিধুসর' বইটিতে তোমার লেখা কয়েকটি ছোটো গল্প পড়তে পাওয়া গেল। বইটির নামের ছাপে এই গল্পগুলির একটি সংজ্ঞা তুমি দিয়েছ। বোধ হয় জানাতে চাও এর অধিকাংশ নায়ক নায়িকা এবং ঘটনা প্রাত্যহিক তুচ্ছ জীবনযাত্রার ধুলো পড়ে ম্লান। কিন্তু আমি মনে করিনে এ সংজ্ঞা তোমার গল্পগুলি সম্বন্ধে ঠিক খেটেছে। প্রথম গল্পটি পড়েই দেখা গেল, এ তো নেহাৎ পায়ে হাঁটা দাগপড়া চলতি জীবনের কথা নয়। এ তো সচরাচরের বাহির এলেকার। তারপরে দেখলুম অন্যান্য সব গল্পেই সচরাচরত্বের ভিতর থেকে অপ্রত্যাশিতের উঁকি-মারা মুখ কোথাও বা ব্যঙ্গ হাস্যে কোথাও বা দাঁত খিঁচিয়ে দেখা দিয়েছে। সেইটেই তার বিশেষত্ব, ধুলির আবরণটা নয়। আমাদের ঘরের সামনের ঐ বাগানে একটা আম গাছ আছে। প্রথম বয়সেই তার বারো আনা মুড়িয়ে খেয়েছে গোরুতে। সেই অভাজনের কাছ থেকে ফলের আশাই করিনি। এবার বসন্তে হঠাৎ দেখি তার একটিমাত্র ডাল ফলের ভারে নেমে পড়েছে। পঙ্গু জীবনের এই অন্তর্গূঢ় কৌতুক তোমার প্রায় সব গল্পেই হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। এরা সব আচমকা, একে ধুসরতা বলা চলে না।

চলতে চলতে কেউ যদি পিছন থেকে হঠাৎ সজোরে পিঠ চাপড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে রাস্তায় "কী হে" তার পর মুখ ফিরতেই বলে, "মাপ করবেন মশাই মনে করেছিলুম আমাদের ক্ষুদু" অবশেষে কসে আলাপ জমিয়ে পাঁচটাকা ধার নিয়ে চলে যায়, তবে এই ঘটনায় অকিঞ্চিৎকরতার ভিতর দিয়ে আকস্মিকতার যে আঘাত পাওয়া যায়, সেই চাপড় আছে তোমার গল্পে। বইটি পড়ে খুশি হলুম। ইতি ১৯/৩/৩৯

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠকদের আমরা ভরসা করি আমাদের কথা বোঝাতে পেরেছি এবং হয়তো কিছুটা খুশিও করতে পেরেছি। প্রায় হারিয়ে যাওয়া দু'তিনটি গল্পকে উদ্ধার করার জন্যও হয়তো তাঁরা আমাদের কথা মনে রাখবেন। আরও দু' তিনটি গল্পকে সংকলন করা যে যেতো না, তা নয়। তবে সেগুলি প্রকাশে আনুকূল্যের অভাব লক্ষ্য করেছি নানা মহলে। কখনো সুযোগ পেলে সেগুলি পুনশ্চ সংকলন করা যেতে পারে।
পাঠকদের রুচির কাছে এই সংকলন উপস্থিত করে দিলাম। তাদের ভালো লাগাই এই 'ভালো লাগা' সংকলনটিকে মর্যাদা দেবে।

বারিদবরণ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের ভালোলাগা গল্প

আমার চাকরী

সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

স্কুল ছাড়িয়া চাকরীর জন্য প্রথম দুই বৎসর কত লোকের যে উমেদারী করিয়াছি, বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া কত লোকের দ্বারে প্রত্যহ কতবার যে যাওয়া আসা করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। সে সময় যেখানে চাকরী খালির একটু আভাস মাত্র জানিতে পারিতাম অমনি 'পেরির' চাকচিক্যময় সলাইন 'ফুলস্কেপ' কাগজে যথাসাধ্য সুন্দর রূপে দরখাস্ত লিখিয়া সেই মহাতীর্থ সদৃশ সাহেব মণ্ডিত আফিসমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। বাটী হইতে বাহির হইবার সময় মনে স্বতঃই আশার এই ক্ষীণ শিখাটী জ্বলিয়া উঠিত যে 'এবার লাগলেও লাগতে পারে'। কিন্তু হায় প্রত্যাগমন-কালে প্রতিবার এক হৃদয়-ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস সেই ক্ষীণ শিখাটিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের চিরনিবদ্ধ অন্ধকারকে অধিকতর ঘনীভূত করিয়া তুলিত। প্রথম প্রথম বাড়ীর সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন চিত্তে আমার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় থাকিত; এবং বাড়ী ফিরিবার পর যখন তাহারা আমার ক্রন্দনোন্মুখ মুখ হইতে নিষ্ফলতার নিরস কাহিনী শ্রবণ করিত তখন বোধ হয় আমার ন্যায় তাহারাও মর্ম্মের কোন অংশে একটা ক্ষুদ্র আঘাত অনুভব করিত। তাই সে সময় তাহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত 'হায়, এমনি পোড়া অদৃষ্ট!'

এই রকমে দুই বৎসর চলিয়া গেল। আমিও নিষ্ফলতার পেষণে দিন দিন পিষ্ট হইতে লাগিলাম। কিন্তু তবুও চাকরীর আশা ছাড়িতে পারিলাম কই? পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহ সংবাদ পত্রের অপেক্ষায় অতি প্রত্যূষে লাইব্রেরীর চিরপরিচিত বেঞ্চে গিয়া

বসিয়া থাকিতাম। তাহার পর কাগজ আসিলে অগ্রে কর্ম্মখালীর বিজ্ঞাপনটা (wanted) আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতাম। সৌভাগ্য বশতঃ যদি কোন উপযুক্ত চাকরী খালির বিজ্ঞাপন থাকিত তাহা হইলে তীক্ষ্ণধার ছুরির সাহায্যে তৎক্ষণাৎ সেইটিকে হস্তগত করিতাম। একখানি কাগজে উহার অবিকল নকল সংগ্রহ না করিয়া উহাকে স্বস্থানচ্যুত করিবার তাৎপর্য্য, পাছে অন্যে দরখাস্ত করিয়া আমার আশা-পথ কণ্টকিত করিয়া তুলে। তখন চাকরী এতই অমূল্য বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল।

নিয়মিতরূপে লাইব্রেরী হইতে কর্ম্মখালীর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ডাক মারফত দরখাস্ত পাঠাইতে লাগিলাম। কেবল যেগুলি বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানা সমেত প্রকাশিত হইত সেই সকল স্থলে নিজে যাইয়াই দেখা করিতাম। এই রকমে আরও কিছু দিন কাটিল। তাহার পর একদিন দুপুর বেলায় ডাক হরকরা আমার নামে এক খানি চিঠি দিয়া যায়। তখন আমি দিবা নিদ্রায় অভি-ভূত ছিলাম। কারণ সে সময় আমার 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।' ঘুম ভাঙ্গিলে ছোট ভাই চিঠি খানি দিয়া গেল। চিঠির উপরে আমার নাম ও ঠিকানা লিখা ছিল। এবং উহা খুলিবার সময় মোহরের উপর নজর পড়াতে দেখিলাম উহা প্রথমে জেনারেল পোষ্ট আফিসে ফেলা হইয়াছিল। তখন আবার আশার বাণী হৃদয়-কর্ণে বাজিয়া উঠিল। কম্পিত হস্তে ত্রস্তভাবে চিঠি খুলিয়া পড়িয়াই আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিলাম। একটী আফিস হইতে সাহেব চিঠি লিখিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। অবিলম্বে এ শুভ সংবাদ বাড়ীর সকলে শুনিল। বয়স্ক ব্যক্তিরা বলিলেন, "হবে না ত কি! তুই কি লেখা পড়া শিখিস নি?" স্ত্রীলোকেরা বলিলেন "আহা তাই হোক। এই পূর্ণিমাতে বাবা সত্যনারায়ণের স পাঁচ পয়সার সিন্নি দেবো।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চিঠি খানিতে পরদিবস দশটার সময় সাহেবের সহিত তাঁহার আফিসে দেখা করিবার কথা ছিল। সুতরাং পরদিবস নয়টার মধ্যেই স্নানাহার শেষ করিয়া লইতে হইল। তাহার পর সিন্ধুক হইতে জামা কাপড় বাহির করিয়া বেশ ভূষা করিয়া উদ্দেশে দেবতাদের প্রণাম করিয়া যখন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি সেই সময় রতনদার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হইল। রতনদা সম্পর্কে আমার ঠাকুরদাদা হইতেন।

তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে ভায়া, আজ এত সকাল সকাল কোথায় ?"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম "আজ্ঞে এই চাকরীর চেষ্টায়।"

রতনদা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাও জোগাড় হোল নাকি ?"

আমি। "এক জায়গা থেকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

রতনদা। "তা একবার উপরে চল। বিশেষ দরকার আছে।"

পুনরায় উপরে যাইতে আমি অনেক আপত্তি করিলাম। অধিক কি ইহাও জানাইলাম যে সাহেব দশটার সময় দেখা করিতে লিখিয়াছেন। কিন্তু তখন এ সব আপত্তি শুনে কে ? রতনদা আমাকে টানিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং মাকে ডাকিয়া বলিলেন "বৌমা, ছেলেটাকে কি এমনি করে সাজিয়ে দিয়ে সাহেবের কাছে পাঠাতে হয়। এ বেশে সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে যে তারা দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। কই চিরুনী খানা দাও ?"

মা হাসিতে হাসিতে চিরুনী ও ব্রুষ আনিয়া দিলেন। তখন রতনদা আমার কেশবিন্যাসে বসিয়া গেলেন। সে সময়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্যে আমি তাঁহাকে কত কাকুতি মিনতি করিলাম কিন্তু আমাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। অধিকন্তু যখন আমি বড়ই

অধির হইয়া উঠিলাম তখন তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন "দেখ্ ছোঁড়া এবার নড়বি তো তুই গালে তুই চড়্ বসিয়ে দেব।" পাঁচ মিনিট পরে রতনদার হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া গেল। তখন তিনি আমার সম্মুখে আরসি খানা ধরিয়া বলিলেন "দেখ্ না শালা দেখ্ না; এখন কা'কে দেখতে ভাল হ'লো! তোকে না তোর এই বুড়ো দাদাকে?"

প্রত্যুত্তরে আমি একবার দর্পণে আমার চেহারা খানা ভাল ক'রয়া দেখিয়া ঈষৎ হাসিলাম। তখন রতনদা বলিলেন "দেখিস্ ভাই, সাহেব দেখে যেন ভেবড়ে যাস্‌নে? মাথা ঠাণ্ডা করে' সাহেবের কথাগুলো আগে ভাল করে' শুনে তাহার পর বেশ গুছিয়ে তাহার জবাব দিস্। যদি একবার কাজে বস্‌তে পারিস্ তা' হ'লে আমি বলে' দিলুম তোর চাকরী আর মারে কে? এমন চাঁদপানা মুখ দেখলে সাহেবের মাথা ঘুরে যাবে! দাদা, আমরাও একসময়ে সাহেবের চাকরী করে' সংসার ধর্ম্ম ক'রেছি। সাহেবদের মেজাজ বুঝতে আমাদের আর বাকী নেই। আমরা বরাবর দেখেছি যে লোকটার চেহারাখানা একটুকু জমকালো, যার রংটা একটু কটা, —মুখ খানা ঘোরালো সে মাহিনা বাড়িবার সময় ঠিক্ দশ টাকা পেয়ে বসে আছে, আর আমাদের মত কালিন্দে-কেষ্টরা গোনা পাঁচটা টাকা। তাও অতি কষ্টে।"

আমি অনুগত ভক্তের ন্যায় তদগতচিত্তে রতনদার বক্তৃতা সেদিন আর বেশী শুনিতে পারিলাম না। কারণ পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা। কাজেই দ্রুতপদে বাড়া হইতে বাহির হইলাম। রতনদাও পিছনে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিতে বলিতে বাজারে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে আফিসে পঁহুছিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। সেদিন সাহেব আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন। সাহেবের সঙ্গে কথা কহিবার সময় আমার মনে রতনদার উপদেশ জাগিতেছিল। তাহার ফলে আমার প্রত্যুত্তরে সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে একটা পঁচিশ টাকার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন; এবং পরিদবস হইতে কাজে যোগ দিবার জন্য আমাকে বলিয়া দিলেন।

বাড়ী আসিয়া দেখি রতনদা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন দাদা কাজ ফতে করে' এসেছো তো?"

রতনদার কথায় আমার কেমন একটু কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠিল তাই বলিলাম "হ্যাঁ, চিরকাল যা হয়ে আসছে তাই হ'য়েছে!"

"কি গলা ধাক্কা?"

"তা ছাড়া আর কি!"

"তাই বুঝি আজ চোখের কোণে জলের বদলে হাসির ঢেউ! দূর শালা শাগুড়ে।"

এইবার আমি হাসিয়া ফেলিলাম। তখন আর প্রকৃত কথা গোপন করা চলিল না। আমার সফলতায় সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিল বটে কিন্তু সেদিন সেই সরল বৃদ্ধ যে যথার্থ সুখ অনুভব করিয়াছিল তাহার দীপ্তিহীন নিরস চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়া তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়াছিল।

সাহেবে পছন্দ করিয়া লইয়াছে এই হিংসায় আফিসের অপর বাবুরা দিন কতক আমার সঙ্গে কেহই আলাপ করিল না। আমি

যে বাবুটীর অধীনে নিযুক্ত হইয়াছিলাম তিনিও আমার পরিচয় গ্রহণের কোন ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবু তোমার কত টাকা মাহিনা হ'লো?"

অপরিচিত ব্যক্তি পরিচয় গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার আয়ের খতিয়ান লওয়া যে শিষ্টাচার বিরুদ্ধে ইহা জানিয়াও আমি যথাসম্ভব নম্রস্বরে বলিলাম "আজ্ঞে পঁচিশ টাকা।"

"একেবারেই পঁচিশ টাকা?" এই বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন "নরেন, এখানে তোমার দেখছি আর কোন সুবিধা নাই। এখন বাহিরের লোকদেরই খাতির বেশী।"

নরেন বলিল "তাইত দেখ্‌ছি। আচ্ছা পরে বোঝা যাবে।"

নরেনের কথায় আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু ইহার কারণ তখন কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। ক্রমে শুনিলাম আমি যাঁহার অধীনে কাজ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম তাঁহারই নাম প্রিয়বাবু এবং নরেন তাঁহারই পুত্র। সে তখনও এপ্রেন্টিস্ খাটিতেছিল। আমাদের ঘরে আমরা এই তিনজন ছাড়া আর কেহ বসিত না।

কাজ কর্ম্ম বুঝিতে এক মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে আফিসের সকল বাবুর সঙ্গে আমার এক প্রকার আলাপ হইয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে হারুবাবুর সঙ্গে আমার বড়ই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। হারুবাবু বা হারাণবাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি আফিসে সিপ্‌সরকারের কাজ করিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজে রপ্তানি মাল পাঠাইয়া দিয়া কাপ্তেনের নিকট হইতে মালের রসিদ লওয়া এবং আমদানি মাল জাহাজ হইতে খালাস করিয়া আনিয়া গুদাম-জাত করা হারুবাবুর কাজ ছিল। সেই জন্য তিনি কোম্পানির নিকট হইতে আঠারোটা টাকা বেতন পাইতেন। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণের আরও দু' পয়সা উপরি পাওনা ছিল। হারুবাবুর একে বয়স হইয়াছিল তাহার

উপর হাঁপানির দৌরাত্ম্যে তিনি একেবারে ধনুকের ছিলার ন্যায় বাঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। হারুবাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। টিফিনের পর যদি কোন দিন তিনি আমাকে টিফিন ঘরে একলা দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে মালিকে পুনরায় তামাক সাজিতে বলিয়া তিনি আফিস সংক্রান্ত অনেক গুপ্তবিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া আমাকে ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবার জন্য সতর্ক করিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে তিনি আমার নিকট প্রত্যেক বাবুর প্রকৃতির বিশিষ্ট পরিচয় দিতে কখনও সন্দেহমনা হইতেন না। তিনি বেশ জানিতেন যে আমি ভুলেও তাঁহার এই সরল বিশ্বাসের প্রাণঘাতী প্রতিফল দিবার বাসনায় অকৃতজ্ঞের পথ অবলম্বন করিব না।

যেদিন হারুবাবুর মুখে আমার প্রতি প্রিয়বাবু ও তাঁহার পুত্র নরেনের আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের আভাস পাইলাম সেই দিন বুঝিলাম এখানে থাকিয়া আমার অন্ন করিয়া খাওয়া বড় অধিক দিন চলিবে না। কোন অছিলায় আমার এই পঁচিশ টাকার চাকরীর মাথা খাইবার জন্য ইঁহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিলেন। সেদিন বাড়ী আসিয়া রতনদার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে একথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন "ভায়া বল্‌তে কি আমিও অমন তোমার মত কত ছোঁড়ার পেছনে প্রথম প্রথম লেগেছিলুম; কিন্তু তাহার পর তাহারা যত পুরানো হ'য়ে আসতো আমারও তাদের সঙ্গে বেশ মিল হ'য়ে যেত। দাদা, ওটা আফিসের একটা প্রধান দস্তুর। তুমি এখন এক কাজ কর। তোমার বাবু ও তাহার ছেলের দিন কতক খুব খোসামোদ লাগিয়ে দাও। তা হ'লেই দেখবে সব বাঁকা চাল সোজা হ'য়ে আসবে।"

আমি বলিলাম "এদের কাছে খোসামোদে যে কিছু হ'বে তা'ত আমার বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ ছেলেটাত একটা বিচ্ছু!"

এই কথা শুনিয়া রতনদা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "খোসা-মোদে বশ হয় না এমন লোক ত আজ পর্য্যন্ত দেখ্লুম না। নিয়মিত রূপে দেবতার অর্চ্চনা করিলে তিনিও মুখ তুলে চান তা মানুষ কোন ছার! এই বুড়োর কথাটা শুনে তুই ভাই একবার ওদের খোসামোদ কোরেই দেখ্না। তাহার পর এতেও যদি তাহারা তুষ্ট না হয় তা হ'লে পিয়াদায় আক্কেল সেলামী দিয়ে যাবে।"
সেই দিন মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে রতনদার কথানুযায়ী চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আর শাস্ত্রেও বলে 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য'।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রতনদার পরামর্শমত প্রিয়বাবু এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র নরেনের মন জোগাইয়া চলিতে লাগিলাম। তাহাদের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া কাজ করিতে লাগিলাম। বাড়ী আসিবার সময় তাহাদের সঙ্গে কিছু দূর আসিয়া পুনরায় সোজা পথে ফিরিয়া বাড়ী আসিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন তাঁহাদের পিতাপুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিলাম। সেদিন হারুবাবুকেও নিমন্ত্রণ করিবার লোভ ছাড়িতে পারি নাই। ব্রাহ্মণ ইহাতে বড়ই খুসী হইয়াছিলেন। সেদিন সকলে আহারে বসিলে পর রতনদা প্রিয়-বাবু এবং নরেনকে বেশ মিষ্ট ভাষায় আমার হইয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। প্রিয়বাবুও আমার উন্নতি চেষ্টা করিবার জন্য তখন মৌখিক স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রাণে বোধ হয় ঈর্ষ্যার বাতি জ্বলিতেছিল।
আহার শেষ হইলে প্রিয়বাবু পুত্রের সহিত বিদায় লইলেন। তিনি হারুবাবুকেও সঙ্গে যাইবার জন্য ডাকিয়াছিলেন কিন্তু হারুবাবু তখন ধূমপানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহাদিগকে অগ্রগামী হইতে হইয়াছিল। হারুবাবু তামাক খাইবার অছিলায় বড়বাবুর

সঙ্গ-ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে রতনদাকে বলিলেন "দাদা, আমি এই আগুন হাতে করিয়া দিব্য করিতেছি যে যতদিন আমার দানাপানি এ আফিসে থাকিবে ততদিন রমেশের (আমার নাম) অন্ন কেহই মারিতে পারিবে না। আমি উহাকে প্রথম হইতেই ছেলের মত ভালবেসে ফেলেছি।" এই বলিয়া হারুবাবু খুব জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে রতনদা আমাকে বলিলেন "দেখ্‌লি শালা চাঁদপানা মুখের জোরটা দেখ্‌লি ! দাদা, এর আগে একদিনও কি তুমি জানিতে পেরেছিলে যে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমার অজ্ঞাতে তোমাকে একেবারে এতটা ভালবেসে ফেলেছে ? তোমার পিছনে পিছনে হিতকারী বন্ধুর ন্যায় ওই ব্যক্তি সর্ব্বদাই ফিরিতেছে ? তুমি উহার শত ভাবনার মধ্যে একটা প্রধান ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছ ?" এই বলিয়া রতনদা খানিক থামিলেন। তাহার পর পুনরায় বলিলেন "ভাই, আর এক কাজ করো ; ভুলেও কারুর অনিষ্ট চেষ্টা করিওনা। তাহা হইলে দেখিবে উন্নতির পথ কত সোজা, কত সরল।"

সেই মাসের মাহিনা হস্তগত হইলে আমি প্রিয়বাবুর কেশবিরহিত মস্তকের জন্য দুই শিশি কুন্তলীন এবং নরেনের জন্য একশিশি দেলখোস কিনিয়া লইয়া বাড়ী আসিলাম। পরদিবস আফিস যাই-বার পূর্ব্বে রতনদাকে আমার সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া বলিলাম "দাদা, মুখে এত খোসামোদ করিতেছি তবুও বাপ বেটার মন পেলুম না। ছেলেটাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলে সে ত ফোঁস করিয়া উঠে। আর কর্ত্তা তিনি ত সকল কথার একটু ভূমিকা না করিয়া কখন সিধা জবাব দেন না। তাই কাল আসিবার সময় মনে করিলাম প্রিয়বাবুর জন্য দুই শিশি কুন্তলীন কিনে নিয়ে যাই ; এবং নরেনকেও কিছু না দিলে সে একেবারে গস্‌ গস্‌ করিবে তাই

এই দেলখোসটা তাহার জন্য আনিয়াছি। আমার এখন কেউটের চেয়ে সলুইকে বেশী ভয়। কিন্তু দাদা, তাও বলি, এ রকম করে কি চাকরী পোষায়!"

রতনদা বলিলেন "দাদা, দিন কতক এই রকম ক'রে কাজ কর্ম্ম গুলো বেশ শিখে নাও তাহার পর আর কে কার খোঁজ রাখে।" শেষে বলিলেন "তা তোমার এ পলিসি মন্দ নয়। আর যদি তোমার বরাত জোরে এবং তেলের গুণে প্রিয়বাবুর মাথায় কচি কচি দুর্ব্বো ঘাসের মতো চুল গজিয়ে উঠে তা হ'লে সে তোমাকে একটু স্নেহ না করে' কখনই থাক্‌তে পারবে না। আর অই নরেন ছোঁড়াটাকে এত ভয় করবার কোন বিশেষ কারণ দেখি না।"

সেই দিন আফিসে গিয়া প্রথমেই প্রিয়বাবুকে দুই শিশি তৈল উপহার দিলাম। বলা বাহুল্য সেদিন তাঁহার চিরগাম্ভীর্য্যসমাকীর্ণ মুখমণ্ডল কিছুক্ষণের জন্য হাস্যবিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং নরেনও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিল।

সেই বৎসর পূজার সময় নরেনের পনর টাকা মাহিনা হইল। প্রিয়-বাবু ছেলের জন্য যথাসাধ্য ওকালতী করিয়াছিলেন; কিন্তু সাহেব কিছুতেই তাঁহার রায় বদলাইলেন না; বরঞ্চ প্রিয়বাবুকে বলিয়া-ছিলেন "তোমার ছেলে যদি রমেশের মতো চালাক হইত এবং কিছু লেখা পড়া বোধ থাকিত তাহা হইলে আমি কখনই রমেশকে আফিসে লইতাম না। রমেশ আজকাল ইন্‌ভয়েসের সমস্ত কাজ একেলা করিয়া থাকে, এবং আমরাও উহাকে এ কাজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু তোমার ছেলে দুই বৎসর আফিসে থাকিয়াও একটা সামান্য এক্সচেঞ্জ কসিতে পারে না। তুমি কোন্ সাহসে তাহার হইয়া রেকমেণ্ড করিতে আসিয়াছ? যাও, যাও, ইহার অধিক আর কিছু হইবেক না।"

প্রিয়বাবু সাহেবের কামরা হইতে বিষণ্ণ বদনে নিজ স্থানে আসিয়া

বসিলেন। অমনি নরেন তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়বাবু বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাহার জায়গায় যাইয়া বসিতে বলিলেন। গতিক যে বড় ভাল নহে আমি তাহা আভাসে বুঝিয়াছিলাম। সেই দিন টিফিন-ঘরে হারুবাবু আমাকে প্রকৃত বিষয় জানাইয়াছিলেন। নরেনের মাহিনা লইয়া সাহেবের সহিত প্রিয়বাবুর কথাবার্ত্তা তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন!

এখন আমি আর প্রিয়বাবুর তাঁবে নহি। ইন্‌ভয়েস্ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের চার্জ্জ এখন আমার উপর। আমার টেবিলের দুই পার্শ্বে দুইটী ড্রয়ার তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ী আসিবার সময় এখন হইতে উহার মধ্যে সমস্ত কাগজ পত্র রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া আসিতে হয়। চাবি দক্ষিণ দিকের ড্রয়ারের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়া আসিতাম। এখন আমার একটা বিশেষ কাজ কমিয়াছে। প্রিয়বাবুর মনঃস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে আর নিত্য নব পথ অন্বেষণের জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না। তবে উহা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। বোধ হয় ইহার কারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যেদিন নরেনের মাহিনা ঠিক হইল সেই দিন হইতে প্রিয়বাবুর মেজাজ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছিল। আফিসের কাজ করিতে হয় তাই তিনি করেন। এখন তাঁহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রিয়বাবু স্বল্প কথায় তাহার জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। সকল বিষয়ে ঔদাসীন্যের লক্ষণ দেখা যাইত। সমস্ত কাজেই গাফিলতীর যেন একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ জড়িত থাকিত। নরেনের প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সে যেন কিসের অন্বেষণে নিয়ত ছোঁক ছোঁক করিয়া এধার ওধার ঘুরিয়া বেড়াইত; এবং অবসর পাইলেই

আমার উন্মুক্ত ড্রয়ারের মধ্যে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিমেষ মধ্যে অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলির একখানি সঠিক তালিকা গ্রহণ করিত। সে সময় হঠাৎ আমাদের দৃষ্টিবিনিময় ঘটিলে সে থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিত যে, আগামী 'মেলের' জন্য সেবার কতকগুলি ইন্‌ভয়েস্‌ বিলাতে পাঠাইতে হইবে? আমি তাহার চাতুরী বুঝিতে পারিয়াও তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতাম। কিন্তু নরেনের এবম্বিধ অস্বাভাবিক অস্থিরতা এবং গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধন হেতু চতুরতার কারণ বড় অধিক দিন গোপন রহিল না। একদা বৈশাখের ঈষদুষ্ণ মধ্যাহ্নে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ইন্‌ভয়েসের সমস্ত কাজ আমার হাতে আসাতে আফিসের সকল সাহেবের সহিত আমার অল্পাধিক সংশ্রব ছিল। সুতরাং দিনের মধ্যে অনেকবার আমাকে সাহেবদের ঘরে যাওয়া আসা করিতে হইত। এক সপ্তাহের 'মেল' চলিয়া গেলে আমাকে আবার পরবর্ত্তী মেলের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। বস্তুতঃ অপরাপর কেরাণীর ন্যায় বৃহস্পতিবার মেল ক্লোজ করিয়া সপ্তাহের অবশিষ্ট কয় দিবস একটু আরাম করিবার অবসর আমার ছিল না। সাহেবেরা ইহা জানিতেন; এবং সেই জন্য আমার বেতন সম্বন্ধেও ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাসের কোন্‌ তারিখ মনে নাই এক বুধবারে রাত্রি সাড়ে আট্‌টা পর্য্যন্ত বাতি জ্বালিয়া পরদিবসের মেল সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজ এক প্রকার শেষ করিয়া বাড়ী ফিরি। পূর্ব্বের ন্যায় সে দিবসও লাল ফিতা সংলগ্ন চাবির গোছা ড্রয়ারের গায়ে ঝুলান ছিল। পরদিবস একটু সকাল সকাল আফিসে আসিয়াছিলাম। তখন বেলা নয়টার বেশী হয় নাই। সে সময় আফিসে কেহই আসে নাই। কেবল মাত্র পাখাটানা কুলী আমাদের ঘরের বাহিরে আমাদের অপেক্ষায় বসিয়াছিল। আমি আসিলে সে সেলাম ঠুকিয়া পাখা

টানিতে আরম্ভ করিল। আমি অগ্রে লাল কালী দিয়া একখানি ছোট কাগজে 'শ্রীদুর্গা' লিখিলাম। তাহার পর ড্রয়ার হইতে ইন্‌ভয়েস্‌গুলি বাহির করিয়া লইয়া একবার কসা মাজাগুলি মিলাইয়া লইলাম। বেলা দশটার পর আফিসের সমস্ত বাবু ও সাহেবেরা আসিলেন। সে দিনও হারুবাবু অভ্যাস মত আমার নিকট আসিয়া একটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে আমার মস্তক আশীর্ব্বাদ বচনে অভিষিক্ত করিয়া তিনি নীচে গুদাম ঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

বেলা একটার পর ছোট সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ছোট সাহেব প্রতি মেলের ইন্‌ভয়েস্‌ চেক করিয়া তাহাতে সই করিলে তবে উহা বিলাতে পাঠান হইত। একটার পর হইতে চেক আরম্ভ হইত। ছোট সাহেবের ডাক শুনিয়া ইন্‌ভয়েসের তাড়া লইয়া আমি তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিলাম। তাহার পর সাহেবের বইয়ের সহিত মিলাইয়া চেক্‌ হইতে লাগিল। দুইটার কিছু পূর্ব্বে সমস্ত ইন্‌ভয়েস্‌ চেক্‌ করা শেষ হইয়া গেল; আমিও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। তখন ছোট সাহেব সস্মিত বদনে আমাকে আমার প্রভূত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। বলা বাহুল্য আমিও সপ্তাহের দারুণ পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি মনিবের এবম্বিধ গুণগ্রাহিতার আতিশয্যে ত্বরায় বিস্মৃত হইলাম। তাহার পর যখন আমি আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিলাম সেই সময় নরেন জিজ্ঞাসা করিল "কিহে রমেশ, সমস্ত ইন্‌ভয়েস্‌ চেক্‌ করা হয়ে গেল নাকি?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম "হ্যাঁ ভাই, বাঁচা গেল!"

কিঞ্চিত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "একেবারে সমস্ত?"

তখন আমার কেমন সন্দেহ হইল। তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন বল দেখি; এক আধ খানা কি টেবিলে পড়েছিল?"

"না তাই বলছিলুম ; এই এতগুলাইন্‌ভয়েস্‌ এরি মধ্যে চেক্‌ হয়ে গেল। আর এক আধখানা পড়ে থাকবার যো কি ! সাহেব বইয়ের সঙ্গে সব মিলিয়ে নিয়ে তবে ত ছেড়েছে ?"

নরেনের কথায় আমি একটি সামান্য 'হুঁ' দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

সেই দিন বেলা চারিটার সময় বড় সাহেব আমায় তলব করিলেন। হঠাৎ মেনেজারের ডাক শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কারণ কোন বিশেষ আবশ্যক না হইলে মেনেজার কাহারও বড় একটা খোঁজ রাখিতেন না। তদ্ব্যতীত আফিসের নূতন পুরাতন সমস্ত বাবু মেনেজারের সুদীর্ঘ মূর্ত্তিটীকে যমের ন্যায় ভয় করিত। আমিও তাহাদের দলের একজন। সুতরাং যূপকাষ্ঠবর্ত্তী উৎসৃষ্ট ছাগশিশুর ন্যায় কম্পিতকলেবরে ধীরে ধীরে মেনেজারের সুবৃহৎ কামরায় গিয়া ঢুকিলাম। সে সময়ে ছোট সাহেব মেনেজারের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলেই মেনেজার তাঁহার উজ্জ্বল নীলাভাযুক্ত গোল চোখদু'টা আমার ভয়-বিকম্পিত শুষ্ক মুখের উপর রাখিয়া অতি কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবু, লিভার-পুলের গানির ইন্‌ভয়েস কোথায় ? মিষ্টার জার্ডিন কি তোমায় উহা দেন নাই ?" জার্ডিন ছোট সাহেবের নাম।

আমি কম্পিতকণ্ঠে বলিলাম "আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোট সাহেব যে উহা আমাকে দিয়াছিলেন তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে। আমি উহা এখনি আমার টেবিল হইতে আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া দ্রুতপদে সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে আমার টেবিলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার পর তন্ন তন্ন করিয়া ড্রয়ার দু'টী খুঁজিলাম। পার্শ্ববর্ত্তী ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি হইতে কাগজগুলি তুলিয়া তাহাদের পরীক্ষা করিলাম কিন্তু আবশ্যক ইন্‌ভয়েসের কোন সন্ধান পাইলাম না। তখন ব্যাকুল কণ্ঠে নরেনকে সমস্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই যদি পেয়ে থাক দাও, আমি

তোমাকে আমার এই মাসের মাহিনা পেলেই যাহা খেতে চাও পেট ভরে তাহাই খাওয়াব। দাও ভাই, যদি নিয়ে থাক এ সময় দাও। এখন সাহেবকে দিতে না পাল্লে আমাকে জেল খাট্‌তে হবে।”
আর বলিতে পারিলাম না, আমার গলা ধরিয়া আসিল। চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।
গম্ভীর বদনে নরেন উত্তর দিল “বাঃ! আমি কি জানি? তুমি কি আমার কাছে উহা জিম্মা রাখিয়াছিলে যে এখন চাচ্ছ? বেশ লোক ত! তুমি এখন জেল খাট্‌বে কি পাথর ভাঙবে তা আমি কি জানি!”
অধিক বিলম্ব হইতে দেখিয়া ছোট সাহেব আমাদের ঘরে আসিয়া আমাকে ইন্‌ভয়েসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমার শরীরের সমস্ত রক্ত এক সঙ্গে আমার মাথায় আসিয়া জমা হইয়াছিল। আমি জড়িতস্বরে বলিলাম “কই সেটা দেখ্‌তে পাচ্ছি না!”
ছোট সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন “কি বল্‌লে; দেখ্‌তে পাচ্ছনা? সেটা কোথায় গেল? তুমি জান, মার্চ্চেন্টদের ইন্‌ভয়েসেই প্রাণ। বিশেষতঃ ঐ লিভারপুলের ইন্‌ভয়েস্ আমাদের হেড্ আফিস অনেক কষ্টে এবার অন্য পার্টির হাত থেকে সিকিওর করেছে। সেই জন্য নূতন কাজ বলিয়া উহা আমার বইয়ের মধ্যে লিষ্ট ভুক্ত ছিল না। তাই চেক্ করিবার সময় ধরা পড়ে নাই। কিন্তু উহা মেনেজারের নোট বুকে টোকা ছিল। কই, তোমার ড্রয়ার দেখি?”
আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। ছোট সাহেব ড্রয়ার দু'টী বেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইল। ইন্‌ভয়েস্ পাওয়া গেল না।
সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় মেনেজারের কামরায় প্রবেশ করিলেন। সে সময় তাঁহারা পরস্পর যে কি বলাবলি করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না।

তখন আমার বোধ হইতেছিল যেন আমার চারিদিকের আলমরিা সজ্জিত দেওয়ালগুলি আমাকে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তুল্লাকারে ঘুরিতেছিল ! আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কতক্ষণ পরে জানিনা মেনেজারের বজ্র গম্ভীরস্বরে আমার চেতনা শক্তি আনিয়া দিল। তিনি বলিলেন"হ্যালো বাবু, এ ইন্‌ভয়েসের জন্য দোষী কে ?"

আমি শুষ্ককণ্ঠে কাতরস্বরে কহিলাম "আজ্ঞে আমিই দোষী। কিন্তু—"

মেনেজার বাধা দিয়া বলিলেন "আমি "কিন্তু" শুনিতে চাহি না। কেবল যাহা জিজ্ঞাসা করি তুমি তাহারই উত্তর দাও।" তখন পুনরায় প্রশ্ন হইল "তুমি আর কাহাকেও ইন্‌ভয়েস্ দিয়াছিলে ?"

"না।"

"তবে উহা যে তোমার দ্বারাই যে কোন প্রকারে হউক নষ্ট হইয়াছে ইহা ঠিক। কেমন ?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

"কেন ?"

"কারণ, যখন আমি জ্ঞাতসারে এক টুক্‌রা কাগজ ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া নষ্ট করি না তখন—"

"আমি ও সব শুনিতে প্রস্তুত নহি। এর জন্য তোমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এখন তুমি আপনার যায়গায় যাও।"

প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বাহিরে আসিলাম। অমনি আফিসের যত বাবু—অধিক কি দপ্তরি, বিহারা অবধি আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। এবং চারিদিক হইতে অনর্গল প্রশ্নধারা আমার উপর বর্ষিত হইয়া আমাকে অধিকতর ক্লান্ত করিয়া তুলিল।

ইহাদিগের মধ্যে নরেনের ঔৎসুক্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সে কখন আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল কখন বা ছোট সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া

বলিতেছিল "রমেশ very useful hand এখন রমেশের হ্যাণ্ডে hand cuff লাগাও। মরে যাই আর কি 'শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর' !"

আফিসের চার দিকে তখন আমার কথা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল।

খানিক পরে ছোট সাহেব মেনেজারের ঘর হইতে আমাকে ডাকিলেন। আমি ধীরে ধীরে টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন মেনেজার বলিলেন "দেখ বাবু, আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে, আমি পুলিশ ডাকিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করি কিন্তু মিষ্টার জার্ডিন তাহা করিতে দিলেন না। তুমি বোধ হয় জান যে, জার্ডিন সাহেব তোমাকে খুব পছন্দ করিতেন। তিনি এখনও বলিতেছেন যে, এ কাজ বোধ হয় তোমার দ্বারা হয় নাই। কিন্তু এটা কেবল তাহার কল্পনা মাত্র। আজ তুমি আমাদের যে ক্ষতি করিলে ইহার জন্য বোধ হয় আমাকে হেড্ অফিস হইতে বিস্তর ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইবে। যাহা হউক আমি তোমাকে এই দণ্ডে ডিস্‌মিস্ করিলাম। তুমি এখনি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।"

ভয়ে ভয়ে মেনেজারকে একটি সেলাম করিয়া যেমন আমি আমার কম্পিত মস্তকটি তুলিয়াছি সেই সময় দেখি হারুবাবু আমাদের ঘরের পাখাটানা কুলীর সহিত আমার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি সেলাম করিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিলে এক দৃঢ় মুষ্টিতে আমাকে ধরিয়া অন্য হস্তে মেনেজারকে সেলাম করিয়া হিন্দীতে বলিলেন "হুজুর আমি আপনার ইন্‌ভয়েসের খবর জানি।" মেনেজার ব্যগ্রভাবে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? তুমি ইন্‌ভয়েসের কি জান?"

"আমি হুজুরের চাকর। আমি আজ ত্রিশ বৎসর হুজুরের আফিসে সিপ্ সরকারের কাজ করিতেছি।"

"তুমি কি জান বল।"

"এই ছোকরা রমেশ যাহাকে আপনি এই মাত্র ডিস্‌মিস্ করিলেন, ইহার মতো বিশ্বাসী প্রভুভক্ত চাকর বোধ হয় হুজুরের আর একটিও নাই। অধিক কি আমিও তদ্রূপ নহি। কিন্তু আফিসের বাবুরা কেহই ইহার অনুকূল নহে বরং সকলেই ইহার অল্পাধিক শত্রু। ইহার প্রধান শত্রু আপনার বড়বাবু প্রিয়বাবু এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র নরেন। তাহার সাক্ষ্য এই দেখুন।"

এই বলিয়া হারুবাবু পরিহিত অর্দ্ধমলিন বস্ত্রের এক কোণ হইতে এক খানি শত তালি সংযুক্ত কাগজ বাহির করিয়া মেনেজারের সম্মুখে রাখিলেন।

মেনেজার কাগজ খানি দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বাই জোভ্, এই সেই ইন্‌ভয়েস্।"

ছোট সাহেবও ততোধিক চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "তাইত! কিন্তু এমন করিয়া ছিঁড়িয়া জোড়া দিলে কে?"

হারুবাবু বলিলেন "হুজুর কে ছিঁড়েছে তাহা আপনি এই পাঁচ টাকার চাকর পাখা টানা কুলীর মুখে শুনুন। এই কুলীই আমাকে ছেঁড়া ইন্‌ভয়েস্ দিয়াছে। আর আমিই জাহাজে মাল বোঝাই করিবার সময় ইহাকে পুনরায় পূর্ব্বাকারে গড়িয়া তুলিয়াছি।'

তখন পাখা টানা কুলী বলিল "হুজুরসাহেব, এই হারুবাবু আমাকে মাসে মাসে আট আনা জল খেতে দেন। ইনি বলে দিয়েছেন রোজ আট্‌টার সময় আমাকে আফিসে এসে দেখ্‌তে হবে যে কোন্ বাবু সকালে এসে কি করেন। যদি কেউ কিছু ছিঁড়ে ফেলেন, তা হলে আমাকে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে হারুবাবুকে দিতে হয়। আজ বেলা সাড়ে অট্‌টার পর নরেনবাবু আপিসে আসেন। প্রথমে তিনি দুখানা বই খুলে কি দেখেন। তাহার পর রমেশবাবুর মেজের চাবি খুলে এক খানা কাগজ নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন; আর সেই ছেঁড়া কাগজ

আমায় ফেলে দিতে বলেন। আমি নীচে গিয়ে গুদাম ঘরের গাঁট-রীর পাশে সেগুলি রাখিয়া দিই। তাহার পর হারুবাবু আসিলে তাঁহাকে ছেঁড়া কাগজগুলি দিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

তৎপরে সে ইন্‌ভয়েস্‌ খানির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "হুজুর, সাহেব, এই সেই নরেনবাবুর ছেঁড়া ইন্‌ভয়েস্‌।"

পাখাটানা কুলীর জবানবন্দী শুনিয়া সাহেবদ্বয় পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করিতে লাগিলেন! তাহার পর ছোট সাহেব হারুবাবুকে জিজ্ঞোসা করিলেন "বাবু, তুমি এই কুলীকে মাসে আট আনা করিয়া দিয়া প্রত্যহ বেলা আট্‌টার সময় আফিসে আসিতে বলিয়া-ছিলে কেন?"

হারুবাবু বলিলেন "হুজুর আট্‌টার সময় কেন আসিতে বলিয়া-ছিলাম তাহা আপনি উহার নিজ মুখেই সমস্ত শুনিলেন। তবে কেন আমি এরকম মতলব করিয়াছিলাম, তাহা শুনিবার আপনার অধিকার আছে। অমি কেবল এই রমেশকে নিরাপদে রাখিবার জন্য, এই এতগুলি দুর্দ্দান্ত, চির-অনিষ্টকারী বাবুদের হাত হইতে এই নিরীহ বালককে রক্ষা করিবার জন্য এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমি রমেশের অনিষ্টের যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম অবশেষে তাহাই ঘটিয়াছে।"

মেনেজার জিজ্ঞাসা করিলেন "রমেশ তোমার কে হয়?"

সাহবের প্রশ্নে এইবার হারুবাবুর স্বর কাঁপিতে লাগিল। তিনি সিক্তকণ্ঠে বলিলেন "হুজুর, রমেশ আমার কেউ নয় কিন্তু রমেশ আমার সব। উহার নির্ম্মল স্বভাব, সরল প্রকৃতি এবং সর্ব্বাপেক্ষা উহার সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি এই বৃদ্ধকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। উহার বাহির যেমন নয়নাকর্ষক, অন্তর ততোধিক পবিত্র আমি উহাকে ছেলের মতো ভালবাসি।"

এই বলিয়া হারুবাবু বস্ত্রপ্রান্তে চক্ষু মুছিলেন।

সেই সময় ছোট সাহেব বলিয়া উঠিলেন "Baboo, You are quite right !"

মেনেজার তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া আঠারো টাকা বেতনভোগী সিপ সরকার হারুবাবুর সহিত করমর্দ্দন করিলেন। এবং তাহার এই পরোপকারিতার জন্য শতবার ধন্যবাদ নিতে লাগিলেন। তৎ-পরে আমার নিকট আসিয়া ধীরে ধীরে আমার অপবাদ লাঞ্ছিত মস্তকটি দুহাতে তুলিয়া ধরিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন "রমেশ, মিষ্টার জাডিন যে যথার্থই নির্দ্দোষীর উপর তাহার বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আমি এতক্ষণে বেশ বুঝিলাম। আর তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ আজ হইতে আমি তোমাকে আমাদের প্রধান নেটিভ এসিসটেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলাম। তুমি আমার পূর্ব্ব ব্যবহার ভুলিয়া যাও।"

এইবার নরেনের খোঁজ পড়িল। ছোট সাহেব প্রিয়বাবুকে ডাকি-লেন। তিনি শুষ্কমুখে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে হারুবাবু বলিলেন "হুজুর, অদ্যকার এই ঘটনার বিষয় প্রিয়বাবু কিছুই জানিতেন না। আশা করি আপনি উহাকে রেহাই দিবেন।"

সাহেব প্রিয়বাবুকে চিরকালের নিমিত্ত অবসর দিলেন। কিন্তু নরেনের সন্ধান কেহই বলিতে পারিল না। সে ইতিপূর্ব্বেই আফিস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন বাড়ী আসিবার সময় অনেক জেদ করিয়া হারুবাবুকে আমাদের বাড়ীতে আনিয়াছিলাম। তাহার পর রতনদা'কে ডাকিয়া আনিয়া যখন একে একে সবিস্তার হারুবাবুর কীর্ত্তি কাহিনী বলি-লাম, তখন রতনদা হারুবাবুকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "ভাই, আমি রমেশকে সাজাইয়া গোজাইয়া বাঘের মুখে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম ; কিন্তু তুমি তাহাকে সমস্ত দিবস মাতৃ-

পক্ষপুট-নিহিত পক্ষীশাবকের ন্যায় তাহাদের দুর্দ্দান্ত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া অবশেষে তাহার মস্তকে এই মহিমাময় স্নেহ মুকুট পরাইয়া দিয়া আপনার অকপট বাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় দিলে।"

দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ প্রবীণ বন্ধুদ্বয়ের চক্ষের অবিরল আনন্দাশ্রু সেদিন আমার অভিশপ্ত মস্তকে চিরকালের নিমিত্ত যেন শান্তিবারি বর্ষণ করিয়াছিল।

চলোচল

হেমলতা দেবী

গ্রামের মেঠো পথটির পূর্বদিকের মোড়ের মাথায় একখানি মুড়ি-মুড়কির দোকান। সকাল থেকে দোকানে খরিদ্দারের ভিড় খুব বেশি—মানুষগুলি সার ক'রে দোকানখানা ঘিরে দাঁড়ায়—কিসের দোকান, কে বেচে, কী বেচে দূর থেকে চোখে পড়ে না কারো। পাশাপাশি লম্বা দুটো বাঁশ পুঁতে উঁচুতে একটা সাইনবোর্ড টাঙানো—তাতে লেখা "গ্রাম্য-জলপানের দোকান।" এতেই লোকে বোঝে যে দোকানটিতে গ্রাম্য ধাঁচের জলখাবার পাওয়া যায় কিনতে। ভীড় ঠেলে ভিতরে ঢুকলে দেখা যায় চিঁড়ে, মুড়কি, খই, ছোলা ভাজা, বাতাসা, বেগুনি, ফুলুরি, মুড়ির চাকতি, খৈয়ের নাড়ু, নারকেলের ছাপা, চিনি দিয়ে পাককরা চীনের বাদাম প্রভৃতি সস্তা দরের রকমারি জলপান, সার ক'রে সাজানো কেনেস্তারাগুলিতে রাখা। নমুনাস্বরূপ মাটির ছোটো কয়েকটা গামলায় অল্প ক'রে জিনিসগুলি রাখা আছে সামনে—খরিদ্দারের চোখে পড়ার জন্য। পাতলা একখানি পরিষ্কার পুরোনো কাপড় দিয়ে গামলার মাথাগুলি ঢাকা, যেন মাছি না বসে। দোকানের ব্যবস্থা দেখলে মনে হয় নেহাত পাড়াগেঁয়ে ব্যাপার নয়। শহরের কোনো সমজদার লোক এসে যেন গাঁয়ের মাঝে দোকান খুলেছে গ্রামবাসীদের পরিপাটি ক'রে পরিচ্ছন্ন খাবার খেতে শেখাতে।

আজকাল দোকানে দুপুরে ভীড় হয় আরো বেশি। জমিদারবাবুর বিয়ে,—প্রাসাদতুল্য বাড়িখানা তাঁর আগাগোড়া মেরামত হচ্ছে,

মিস্ত্রী মজুর খাটছে অসংখ্য। মেঠোপথে খোয়া ফেলে পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে যেন মোটর যাতায়াত করতে পারে। তাতেও কুলি খাটছে কম নয়। তারা সবাই দুপুরে ছুটি পেলে জলখাবার কেনে এই দোকানে।

দোকানখানা কার কেউ জানে না। দোকানদারকে কেউ কখনো দেখে নি। একটি আট বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে দোকানের মাঝখানে একটি চ্যাপটা টুলে ব'সে সকাল থেকে জলপান বেচে। ঐটুকু মেয়ে জিনিস দিয়ে পয়সা গুণে নেয় ঠিক। হিসাবে ভুল হয় না কোনোদিন। জিনিস নিয়েপয়সা দিয়ে সবাই তারিফ ক'রে ফিরে যায়, বলে—মেয়েটি চালাক বটে—চাষার ঘরে এমন মেয়ে তো দেখা যায় না। সকলেই ধরে নেয়, নিশ্চয়ই মেয়েটি গ্রামবাসী কোনো চাষার হবে। দূরের লোকের এই কথা, গাঁয়ের লোকে জানে কিন্তু এরা কোনো অজানা শহরের মানুষ, বছর দু'তিন হোলো এ গ্রামে এসেছে। কোন্ জাত, কোথায় বাড়ি, কেমন স্বভাবের লোক, কে এদের আছে—কেউ তা জানে না। বাড়িতে একটা বুড়ো ঝি আছে সেই-ই পাড়ার এদিক ওদিক যায়, হাট-বাজার করে, তাকেই লোকে চেনে। পাড়ার সবাই তাকে 'পয়ামাসি' ব'লে ডাকে—নাম তার প্রয়াগ—সে বেশ মিশুক সকলেরই সঙ্গে হেসে কথা কয়, আলাপ করে, তাতে খদ্দের জোটে বেশি। লোকে বলে, পয়ামাসির পয়েই দোকানের এত কাটতি। পয়ামাসি বলায় সে খুশি হয় খুব, তাই এই নামটাই তার গাঁয়ে চল্ হয়ে গেছে।

খুকির নাম শিবরানী, বুড়ো ঝি তাকে রানী ব'লে ডাকে, খুকি তাকে ডাকে ঝি-মা ব'লে। শিবরানীর মা থাকেন বাড়ির ভিতরে, তাঁকে কিন্তু কেউ কখনো দেখে নি। সকাল থেকে বেলা দশটা নাগাদ খুকি জলপান বেচে তারপরে সে নেয়ে খেয়ে পাড়ার পাঠশালায় পড়তে যায়। কাছেই বৃদ্ধ পণ্ডিত রামতারণ ভট্‌চার্যির

পাঠশালা। তাতেই দুপুরবেলা পাড়ার যত ছেলে জড়ো হয়। ভট্‌চাযি মশাই একাই সব ছেলে ঠেকান। দু'চারটি মেয়েও এসে জোটে, সেই সঙ্গে শিবরানীও আসে।

দুপুরে দোকানের যত ঝুঁকি সামলায় পয়ামাসি। তার বেচার ঘটা দেখে অবাক হোতে হয়। যেন দশভুজা হয়ে দশদিকে সে খদ্দেরের খবরদারি করতে থাকে—আচ্ছা হুঁসিয়ার বুড়ি যা হোক। খুশি হয় কিন্তু সবাই তার ব্যবহারে। হাত দুই লম্বা প্রকাণ্ড এক বড়ো বাঁটের হাতায় জলপান তুলে ঢেকে দেয় সে খদ্দেরের কাপড়ে—চুপড়িতে। প্রত্যেক বারেই না চাইতে দুটি বেশি দেয়, তাতেই লোকের মন কেড়ে নেয় এতখানি—বাহাদুরি আছে। দোকানের নাম জেনেছে সবাই, চিনিয়ে দিতে হয় না কাউকে। কাজের চাপ দেখে সম্প্রতি একটা ছোকরা চাকর রাখা হয়েছে পয়ামাসির হাতের তলায় থেকে ফরমাশ খাটবে ব'লে।

দুই

জমিদার রূপেন্দ্রনারায়ণ রায় নব্য যুবা, বয়স ২৩ বছর, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। নাবালক থাক-তেই বাপ স্বর্গগত, নিজেই এখন জমিদারির মালিক, বছর দুই হোলো সাবালক হয়ে জমিদারি হাতে পেয়েছেন ; খরচে হাত, শখও অনেক রকম। মায়ের অভিভাবকত্বে ও দেওয়ানজির তত্ত্বাবধানে রূপেন্দ্রনারায়ণ মানুষ হয়েছেন। তাঁদের তাঁবে থাকায় তখন টাকা জমে গেছে অনেকটা। এখন খরচের পালা পড়েছে, মা, দেওয়ানজি ঠেকাতে পারেন না সহজে। সামনে কিছুটা খাতির রেখে চললেও কলকাতায় গিয়ে বাবু খরচ ক'রে আসেন খুব। বিবাহ দেওয়ার জন্য মা খুব ব্যস্ত, দেওয়ানজি ততোধিক। ব্যয়ের ঘরের অঙ্কটা প্রতি মাসে তাঁরই চোখে পড়ে স্পষ্ট ক'রে, গিন্নিমা ভয় পাবেন ভেবে

কথাটা তাঁর কানে তোলেন না। কখনো কখনো আভাসে ইঙ্গিতে একটু জানিয়ে দেন মাত্র ; বলেন, মা রাজা বাবুর বিয়ে দিয়ে বৌরানী ঘরে আনুন, মা-লক্ষ্মী বাঁধা থাকবেন।

কর্মচারী চাকর বাকর সবাই ছোটো থেকে রূপেন্দ্রনারায়ণকে রাজা-বাবু ব'লে ডাকে। দেওয়ানের কথা শুনে মা উতলা হয়ে উঠেন আরো বেশি। ছেলের শখ গ্র্যাজুয়েট মেয়ে বিয়ে করবেন হাল ফ্যাশানের। সেকেলে মেয়ে সেকেলে বৌ তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। হাজার মেয়ে দেখা হচ্ছে ; বন্ধুদল নিয়ে তিনি নিজেই মেয়ে দেখে আসেন, মনে ধরে না কাউকে। কলকাতায় ডাক্তার নরেশচন্দ্র বসুর মেয়েকে দেখতে গিয়ে চোখ ফেরাতে পারলেন না—দীপ্ত উজ্জ্বল শ্যামল রঙে অজন্তা চিত্রের ছাঁদে কাটা যেন ঢালা মাধুরীভরা মুখখানি, মুহূর্ত দৃষ্টিতে মন হরে নেয় সকটা। বয়স উনিশ, কলেজে বি. এ পড়ে। সঙ্গে ছিলেন দেওয়ানজি, রূপেন্দ্রনারায়ণের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ পাকা কথা দেওয়া হোলো। নাম জানা গেল মঞ্জুমালিকা। রূপেন্দ্রনারায়ণের মনখানাতে যেন সংগীতের ঝরনা পড়ল নাম শোনার সঙ্গে। মঞ্জুর বাপ হাতে পেলেন স্বর্গ, জমিদার জামাই, বি, এ পাশ, রূপে দিক আলো।

দিন স্থির করবেন গিন্নিমা একথা জানিয়ে দেওয়ানজি পাত্রদল নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। অবিলম্বে দিন স্থির—বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল উভয় পক্ষের। ডাক্তারবাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, খরচ করতে পারবেন না বেশি, পাত্রপক্ষে লক্ষটাকা ব্যয় ধার্য হয়েছে। জমিদার বাড়ি ধুমধাম লেগেছে বেজায়। রাস্তাঘাট পাকা কর, বাড়ি-ঘর মেরামত আগেই হোলো শুরু। গহনা কাপড় কেনার ধূমও কম নয়। গিন্নিমা ব্যস্ত সারাক্ষণ। সন্দেশ, মেঠাই, দই, ক্ষীরের বায়না দেওয়া হোলো কলকাতার বড়ো দরের ভিয়েনকর ও স্বর্গীয় কর্তার আমলের ঘোষ-পাড়ার নিতাই গয়লাকে ডেকে। জেলে, কলু, মালী

ও গেঁয়ো ময়রার দল আনাগোনা করছে বাড়িতে। মন-ওজনের মাছের বায়না জেলে, কলু তেলের, গেঁয়ো ময়রা চিঁড়ে মুড়কি ও মালী নিচ্ছে ফুল মালার বায়না। নহবৎ খানায় নহবৎ বসবে, কলকাতা থেকে কনসার্ট ব্যাণ্ডের দলও আসবে, অভিনয়ও হবে একদিন, বাদ যাবে না কিছুই। জমিদার বাড়িতে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। দারোয়ানের সর্দ্দার গোপাল সিংএর সোনার কণ্ঠী, রাজাবাবুকে মানুষ-করা পুরোনো ঝিয়ের হাতে অনন্ত, গলার হার গড়াতে গেছে। একটা ক'রে সোনার আংটি পাবে বাকি সকল চাকর—সঙ্গে নূতন কাপড় তো আছেই। বৌরানী আসার দিন স্টেশন থেকে জমিদার বাড়ি পর্যন্ত বাঁধা রোশনাইয়ে আলো করা হবে সারা পথটি। এমনতরো ধূমের বিয়ে গাঁয়ের লোক কোনোদিন দেখে নাই, এমন পরীরাজ্য কল্পনার খবর তারা কানেও কখনো শোনে নাই গ্রামসুদ্ধ সকলেই উন্মুখ, উৎসুক, উতলা।

পথের দুধারে রঙিন কাগজ আঁটা পাতার লতা জড়ানো বাঁশের খুঁটি বিশ হাত অন্তর পোঁতা তার ফাঁকে ফাঁকে আলো জ্বালা খাস গেলাসের ঝাড় আলোক সজ্জায় চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। জমিদার রূপেন্দ্রনারায়ণ বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরছেন সেই পথে, ঝাঁকে ঝাঁকে বাজি পুড়ছে, হাউই উড়ছে সাঁ সাঁ শব্দে আকাশ চমকে দিয়ে।

সদ্য ফোটা সাদা পদ্ম ও বড়ো বড়ো পাহাড়ি গোলাপে কেয়ারি সাজানো বরের মোটর চলেছে ধীর গতিতে আগে আগে, রূপার গিলটি করা বৌয়ের পাল্কি পিছু পিছু। সেদিনের উৎসব-সমারোহ যে দেখল সে আর ভুলল না। রূপকথার কাহিনীর মতো এর গল্প মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

তিন

ছয় বৎসর কেটে গেছে। জলপানের দোকানখানি আগের মতোই গ্রামের লোককে জলপান জোগায়। আজকাল শিবরানী দোকানে বসে না, বড়ো হয়েছে। বুড়ো ঝি ছোকরা চাকর পালা ক'রে জিনিস বেচে। শহরের লোকদের ইদানিং এ গ্রামে আনাগোনা বেড়েছে আগের থেকে। জমিদারবাবু অনেক রকম শহুরে ব্যাপার গ্রামে এনে ফেলেছেন। সময় সময় সস্তাদরের সার্কাস বায়স্কোপের দল গ্রামবাসীদের আমোদ দিতে ও তামাসা দেখাতে আসে শহর থেকে। কুটীর শিল্প, স্বাস্থ্যোন্নতি, ম্যালেরিয়া নাশ, সমবায় অন্দোলন, নারী-জাগরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে প্রচার বিভাগের বক্তারাও এসে থাকেন বছরে অনেকবার। তাঁরা শহুরে খাবার পছন্দ করেন, জলপানের দোকান খানাতে আজকাল তাই আলুর দম লুচিরও আমদানি দেখা যায়। শিবরানীর মাকে ব'লে বুড়োঝি এই ব্যবস্থা করেছে। শহর-ফেরা গ্রামের লোক শহুরে খাবার খেতে শিখে পয়ামাসিকে ফরমাশ করে লুচি কচুরির। লাভের সংখ্যা বেশি বুঝে পয়ামাসি সেদিকেও মনোযোগ দেয়। মা মেয়ে দুজনেই আজকাল জলপান তৈরির কাজে লাগে তাতে জিনিস জোগানো যায় বেশি।

দুপুরে কাজ সেরে মা মেয়েতে বসেছে মাদুর পেতে দাওয়ায়। শিব-রানী বলল, মা, বাবা এখন কোথায়। কোনো রকমে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না কি।

মায়ের বুকে চাপানো বড়ো একখানা পাথর নাড়া পেয়ে ব্যথা জাগিয়ে তুলল বুকের মধ্যে মেয়ের কথায়।

মা বললেন—চুপ কর্ রানী, ও কথা তুলিসনি, দেওয়ালেরও কান আছে। কী জানি কে শুনে ফেলবে।

রাণু থামে না—আবার বলে, বাবা কি কখনো ফিরবেন না মা।

আমরা কি চিরদিন এই ভাবে কাটাব। আমার বড়ো মন কেমন করে তাঁর জন্যে। তাঁকে কতকাল দেখিনি।

—আমাদের মুখ বুজে থাকতে হবে রানী তাঁর সম্বন্ধে। তুই তখন ছোটো ছিলি—সব কিছু তো দেখিস নি।

—ছোটো থাকলেও মা, তাঁর চেহারা স্পষ্ট আমার মনে আছে। অন্য কোনো দেশে গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না কি। চলো না মা; আমরা অন্য কোনো দেশে যাই—ভালো লাগে না একটানা একজায়গায় থাকতে।

—নিষেধ আছে তাঁর। ব'লে গেছেন, এক জায়গায় স্থির হয়ে থেকো যত দিন আমি না ফিরি।

—কবে সে সময় হবে, বলো মা।

—ধৈর্য হারালে হবে না রানী, তোর জন্য আমি চিন্তিত আছি। তোর মনটা এমন করে আর চেপে রাখা যায় না; বৌরানী নূতন মেয়ে স্কুল খুলেছেন—সেখানে তোকে পড়তে পাঠাব ভাবছি।

—আমি পড়তে গেলে এত কাজ তুমি একলা করবে কী করে মা।

—কেন। সকাল বিকেলে তুই কতকটা কাজ করে দিবি, স্কুল তো দুপুরে।

বৌরানীর স্কুল বারটায় বসে তিনটায় ছুটি, গাঁয়ের মেয়েদের সুবিধার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করেছেন। বুড়ো পণ্ডিত রেখেছেন, অঙ্ক শেখায়, বাংলা পড়ায়, ইংরেজি শেখান তিনি নিজে। নূতন একজন ট্রেনিং পাশ শিক্ষয়িত্রী এনেছেন শহর থেকে মেয়ের সংখ্যা বেড়েছে ব'লে।

—তুই গেলে তোকে যত্ন করেই পড়াবেন, কালই তোকে পাঠিয়ে দেব তাঁর কাছে; তুই এমন মনমরা হয়ে থাকিস না।

পরদিন দুপুরে খাওয়া সেরে মা বুড়ো ঝিকে ডেকে বললেন, প্রয়াগী, রানীকে সঙ্গে করে বৌরানীর স্কুলে নিয়ে যা। সেখানে সে ভর্তি

হবে। কাল থেকে স্কুলের ঝি আসবে নিতে, তোকে আর যেতে হবে না।

শিবরানী ঝি-মায়ের সঙ্গে চলল স্কুলের দিকে বড়ো খুশি মনে।

চার

গ্রাম থেকে ক্রোশ পাঁচছয় দূরে একটি বড়ো নদী, তার তীরে মনোমতো জায়গা বেছে রূপেন্দ্রনারায়ণ নূতন একখানি বাংলো তৈরি করেছেন—নাম "মঞ্জুকুঞ্জ"। প্রীতির চিহ্নটুকু আঁকা রয়েছে নামের সঙ্গে পাথরে সোনার অক্ষরে।

ঐশ্বর্যভরা সংসার, আতিশয্যভরা স্বামীর ভালবাসা—মঞ্জুমালিকা সুখী সকল দিকে। বাপ-মা পরিতৃপ্ত এমন ঘরে এমন বরে মেয়ে দিয়ে। বিয়ের পর মঞ্জু বাপের বাড়ি একটি রাতও কাটায়নি। ছোটো বাড়ি, রাজা জামাইয়ের থাকার অসুবিধা, মোটরে আসে মঞ্জু স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়ি সকালে, সন্ধ্যায় আবার ফিরে যায়। বাপ মা মেয়ে জামাই চোখে দেখেই সন্তুষ্ট থাকেন।

মঞ্জুমালিকার মনটি বড়ো নরম, যেন রেশমি সুতার গোছা—আশ্রয় নিলে আরাম পাওয়া যায় খুব, বাঁধন নিলে ছেঁড়া যায় না সহজে। সব মনটুকু উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে সে স্বামীকে—ভরে গিয়েছে হৃদয়খানা অপূর্ব চেতনায়।

ভরা হৃদয়ে মঞ্জু শাশুড়ির সেবা করে—পূজার সজ্জা সাজায়—দুপুরে হবিষ্য চড়ায়,—খাওয়ার সময় বসে গাওয়া ঘি নুন লেবু দুধ মিষ্টি এগিয়ে দেয় তাঁর পাতের কাছে পরম যত্নে। শাশুড়ির সেবার কাজটি ছেড়ে মঞ্জুকুঞ্জে যেতে মঞ্জুর মন সরে না। রূপেন্দ্রনারায়ণ ঝোঁক ধরলে যেতে হয়—উপায় কী না গিয়ে।

মঞ্জু বলে—মা, চলুন না আমাদের সঙ্গে সেখানে। ফাঁকা জায়গা, বড়ো নদী, দেখলে ভালো লাগতে পারে। বাড়িতে শ্যামসুন্দর

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। দেবার্চনা ছেড়ে মা একপা নড়বেন না। একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমা তিথিগুলিতে দুচারবার মাকে মোটরে নিয়ে গিয়ে মঞ্জু বাংলো দেখিয়ে ও নদীতে স্নান করিয়ে এনেছে।

ছেলের শৌখীন বিলাসরুচি ও অপরিমিত ব্যয় বাহুল্যের বহর দেখে মা বিস্মিত হন, ভাবেন, না জানি এ কত টাকার কাজ। তবে এসব ব্যাপারে তাঁর মন বসে না বেশি। শিক্ষিত ছেলের শখের ওজন বোঝা—রুচির বিচার করা তাঁর কর্ম নয় ভেবে নিজের দৈনিক অভ্যাসগুলিতে মন দেন বেশি করে। ছেলে বৌ নিয়ে সুখে আছে, এতেই তিনি নিশ্চিন্ত।

দেওয়ানজি কিন্তু ভরসাভাঙা গতিক দেখে—এত খরচ! এ যে দেউলে হবার ব্যাপার। রূপেন্দ্রনারায়ণের এক-ঝোঁকা মন ঝুঁকে পড়লে একদিকে, বাগ মানে না কোনো মতে, তিনি জানেন।

মাকে ভক্তি, দেওয়ানজিকে সম্মান, কর্মচারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার রূপেন্দ্রনারায়ণের চিরাগত অভ্যাস—বংশের ধারা। তা থেকে তিনি ভ্রষ্ট হন না কখনো, কিন্তু নিজের ইচ্ছার গতি রুখতে পারেন না এক তিলও কারো কথায়, কোনো কারণে কারো মুখ চেয়ে। তাঁর ঝোঁকের মুখে পড়লে ঘা খেয়ে ফিরতে হয় সকলকে। দেওয়ানজি তাই খরচের খবর শোনাতে চান না সহজে। বউরানী প্রতিকথাটি নরমসুরে কন, মেজাজ না বিগড়োয় ভেবে। ভালো মেজাজে রূপেন্দ্র-নারায়ণ মাটির মানুষ—মায়ের কাছে ছোটো ছেলে।

নদীর বুকে বোট ভাসানো, শীকারে যাওয়া বৌরানীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো, শহরের বন্ধুদল নিমন্ত্রণ করে এনে ভোজ খাওয়ানো, দুপুরে তাসের আড্ডা জমানো তাঁর মুঞ্জুকুঞ্জের এলাকায় শখের সরঞ্জাম। রং-বেরংএর পাখি ও দামি দামি বিদেশী কুকুর পোষার শখও তাঁর কম নয়। মঞ্জুকুঞ্জে নিত্য নূতন পাখি কুকুরের আমদানি দেখা যায়। দশখানা গাঁয়ের লোক দেখতে আসে রাজা-

বাবুর শখের মঞ্জুকুঞ্জ—বলে, রাজাবাবুর নজর বটে। তাঁর দৌলতে দেখলুম নূতন কারখানা।

বৌরানীর শখ মেটাতেও রূপেন্দ্রনারায়ণের কৃপণতা নাই এতটুকু। তাঁর মেয়েদের শেখানো, গ্রামে মেয়েস্কুল করার ইচ্ছা দেখে তৎপর হয়ে সে ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।

স্বর্গীয় কর্তার আমলে গ্রামে একটি মাইনার স্কুল বসে। স্কুলটির ভালোরূপ উন্নতি করে তোলার আগেই তিনি স্বর্গে যান। গ্রামের মুরুব্বিরা রাজাবাবুকে ধরে পড়ল স্কুলটিকে হাইস্কুল করে দিতে। শোনামাত্র আবেদন মঞ্জুর। দিলখোলা রূপেন্দ্রনারায়ণের—দিতে বাধে না কিছু কাউকে। কেবল তহবিলের দিকে নজর দেন না কখনো। দেওয়ানজির উপর হুকুম হোলো, বর্তমান মাস থেকে একশ' টাকা মাসিক সাহায্য ও বাড়ি তৈরি ও সরঞ্জামাদি কেনার জন্য এককালীন দশ হাজার। মুরুব্বিরা সই করিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে গেল। দেওয়ানজির কাছে খবর পৌছল টাকা দেওয়ার। প্রমাদ গনলেন দেওয়ানজি। ব্যাঙ্কের খাতায় জমার ঘর ফাঁক—উপরি ধার টানা হয়েছে বেশ কিছু নূতন কিস্তির আদায় না হোলে নগদে কোনো খরচই চলবে না। কথাটা ফাঁস হোলে মনিবের মাথা হেঁট—ভেবে চিন্তে বললেন—তিন দিন পরে টাকা পাবে।

ওদিকে বৌরানীমার মেয়ে স্কুলেও মাসিক ৫০ টাকা দিতে হবে, সরঞ্জাম সামান্য, দু' একশ'য় মিটে যাবে। পাকা বুদ্ধির প্রবীণ দেওয়ান ঠাওরালেন একটা উপায়। পরদিন সকালে গিন্নিমায়ের পূজা জলখাওয়া শেষ হয়েছে খবর নিয়ে গিয়ে হলেন হাজির তাঁর কাছে। বললেন—স্বর্গীয় কর্তার নামে গ্রামের মাইনর স্কুলটি হাইস্কুল করে তোলা হচ্ছে—নগদ দশহাজার ও মাসিক ১০০ টাকা বরাদ্দ হওয়া চাই আপনাদের এই রাজসরকার থেকে। রাজাবাবুর বড়ো ছাতি, এ দান তাঁর কাছে যৎসামান্য বাপের ছেলে তিনি, সই

করেছেন চাঁদার খাতায়—খুশি হয়ে। তহবিলে কিন্তু মা টাকা নাই আদৌ। কথাটা কেউ জানতে না পারে—শুধু আপনাকেই শোনালুম। স্বর্গীয় কর্তার নামের কাজ ক্ষুণ্ণ হোতে পারে না কোনোদিকে। আপনি এর ব্যবস্থা করে দিন। স্বামীর নাম শোনা মাত্র গিন্নিমা উঠে গিয়ে সেকেলে বড়ো লোহার সিন্দুকটি খুলে তদ্দণ্ডে দশ হাজার টাকার নোট দেওয়ানজির হাতে গুণে দিলেন। মাসিক টাকার অর্ধেক মা দেবেন অর্ধেক স্টেট থেকে দেওয়া হবে, ব্যবস্থা হোলো।

বৌরানীকে বলে ঠিক করলেন, আপাতত তাঁর হাত-খরচ থেকে মেয়েস্কুলের টাকা তিনি দিন, নতুন কিস্তি আদায় হোলে সে টাকা তাঁকে ফেরত দেওয়া হবে।

কাজ হোলো হাসিল—দেওয়ানজির বুদ্ধি কৌশলে। রাজাবাবুর গায়ে আঁচ লাগল না এতটুকু। গ্রামের লোকেরা রূপেন্দ্রনারায়ণের হাইস্কুলের উদ্বোধন সম্পন্ন করল ঘটা করে। জেলার কালেকটার, ডেপুটি, মুনসেফ্ ও আশপাশের ছোটো ছোটো জমিদারবাবুরা এলেন সদলে। তাঁদের আদর আপ্যায়ন জলযোগের ব্যয় চাপল রাজাবাবুর ঘাড়ে, বলা বাহুল্য।

দেওয়ানজি ভাবছেন, খেয়ালের ঝোঁকে খরচ, নিজের মনকে আরামে রাখার, উপভোগের নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করার চেয়ে এসব কাজ হাজারগুণে ভালো। এতে যদি ধারও হয় তবু সেটা সওয়া যায়। প্রজার টাকা প্রজাই ফিরে পায় অনেকটা এতে—সেটা মঙ্গল। মরিয়া হয়ে ফুঁ দিয়ে টাকা উড়িয়ে দেওয়ার ঝোঁকটা রাজা-বাবুর ক'মে এদিকে ঝোঁক পড়লে তিনি বাঁচেন—এতে আর কতই খরচ হবে।

পাঁচ

গ্রামে আজ ম্যাজিক লণ্ঠন লেকচার। গ্রাম্য জল পানের দোকানখানার পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় সামিয়ানা টাঙিয়ে স্কুলের ছেলের দল লণ্ঠন লেকচারের আয়োজন করেছে। সন্ধ্যার আগেই ছেলেরা জড়ো হয়ে হৈ চৈ শুরু করেছে। ছবি দেখায় ছেলেদের মন নেচে ওঠে—স্ফূর্তি জাগে সবার মনে। ছবি দেখতে ও বক্তৃতা শুনতে মেয়েরাও গিয়ে বসে চিকের আড়ালে। শিবরানী সকাল থেকে আবদার ধরেছে—সে লেকচার শুনতে যাবে মাকে সঙ্গে নিয়ে। এত বড়ো মেয়ে একলা পাঠাবেন না মা, সে জানে। শনিবার হাফ্ স্কুল—বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সেরে নিল সে ব্যস্ত হয়ে। ঝিমাকে বলল, সন্ধ্যায় তুই বাড়ি আগলে থাকিস, আমরা লেকচার শুনতে যাব। মা মেয়ে দুজনে গিয়ে চিকের আড়ালে বসলেন।

পাবলিসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত সুবরেণ্য রায় চৌধুরী এম এ বক্তৃতা দেবেন 'গ্রাম সংস্কার ও কৃষক উন্নতি' সম্বন্ধে। লোক জড়ো হয়েছে অনেক ; সকলেই শোনবার জন্য উৎসুক। কৃষিবিদ্যায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্ঞান বেশ পাকা। বোম্বাই কৃষি কলেজে শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁর বলার ভঙ্গীটি নূতনতরো। সকলের মনে বসে স্পষ্ট হয়ে—ধারণা করে সবাই সহজে।

মা-মেয়ে দুজনের বড়ো ভালো লাগল বক্তৃতা, অনেক বিষয় জানা গেল কথাগুলি শুনে। বক্তার সুন্দর শ্রীটিও তাঁদের মনকে টানল তাঁর দিকে। বেশ সুষ্ঠু ভাব। শোনা গেল মাস ছয়েকের জন্য তিনি এ গ্রামের কাজ নিয়ে এসেছেন গ্রাম সংস্কারে গ্রামবাসীদের সাহায্য করবেন ব'লে। কাছেই বাসা, পয়ামাসির দোকানে খাবার কিনতে এসেছেন পরদিন দেখা গেল। পয়ামাসি ভাব ক'রে নিল দু'দণ্ডে,

জেনে নিল তাঁর খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা। নিজে কুকারে রেঁধে খান দুপুরে। বিকেলে পয়ামাসির দোকানে রোজ লুচি তরকারি কিনবেন —পয়ামাসি বরাদ্দ করে নিল। লোক পটাতে পটু সে খুব। গায়ে পড়ে বলল, ছোকরা চাকরটা খাবার তাঁর বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসবে তিনি আসতে না পারলে। আপ্যায়িত হলেন তিনি খুব, একটা ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচলেন। দোকানের খাবার ভালোই—দেখে নিলেন।

পাবলিসিটি অফিসারের নাম ছড়াল অল্পদিনে গ্রামের মধ্যে। ছেলে বুড়া সকলেই তাঁর নাম জেনে গেল—পশার জমল সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে।

ছোটো জাতের লোকেরা এসে জড়ো হয়ে পরামর্শ চায়,—বুদ্ধি দেন তিনি তাদের উন্নতির পথ পাবার। ভদ্র গৃহস্থরা শিক্ষা উন্নতির পরামর্শ নিতে, চাষীরা চাষ আবাদের অভাব অভিযোগ জানাতে আসে দলে দলে। কথা কয়ে বাড়ি ফিরতে সময়ে সময়ে তাঁর রাত হয়ে পড়ে বেশ। পয়ামাসির ফরমাশ মতো ছোকরা চাকরটা ঘরে গিয়ে খাবার রেখে আসে ডালা চাপা দিয়ে। দু' তিন দিন উপর্যু-পরি খাবারগুলো ডালা ঠেলে জানালা ডিঙিয়ে বেড়াল এসে খেয়ে গেছে দেখে সকালে দোকানে গিয়ে পয়ামাসিকে বললেন—আজ তিন দিন আমার কপালে রাতে খাবার জুটছে না, রাতে ফিরে শুধু একটু চা তৈরি করে খেয়ে শুয়ে পড়ি। সকালে আসতে পারিনে কাজের চাপে। কী ব্যবস্থা করব ভাবছি। ব্যবস্থা পয়ামাসির জিহ্বাগ্রে। তখুনি জুগিয়ে গেল কথা,—আমার নিজের একখানা ছোটো ঘর আছে বাড়ির ভিতরের দিকে একপাশে, সেখানে খাবার ঢেকে রাখলে যখনি আসেন খেতে পাবেন—ভাবনা থাকবে না। ব্যবস্থাও হয়ে গেল সেদিন থেকে।

শিবরানীর মায়ের মমতা পড়েছে ছেলেটির প্রতি। বাবুটি জ্ঞান

বুদ্ধিতে যত প্রবীণ বয়সে তত নন। অনুমান ছাব্বিশ সাতাশ হবে। যত্ন করে খাবার করেন শিবরানীর মা, থালাটি ধরে দেয় বুড়োঝি প্রয়াগী। পরের বাড়ি এসে খাওয়া—রাত করেন না আজকাল তিনি প্রায়ই। হুঁস রাখেন ফেরবার। যাতায়াতে পরিচিত হয়ে পড়লেন মায়ের সঙ্গেও কিছুদিনে। মা আজকাল তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তা কন।

রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমন্ত শিবরানীর মুখের দিকে চেয়ে মা ভাবেন —তোকে এমন ছেলের হাতে দিয়ে যেতে পারলে আমি মরে সুখ পাই; কে জানে তোর বাবা ফিরবেন কি না। অজ্ঞান বালিকা তুই—সংসারের কিছু জানিস না; আমি মরলে কোথায় দাঁড়াবি ভেবে ভয় জাগে মনে আমার সর্বদা। ভগবান কী থেকে কী করলেন, কোথায় এনে দাঁড় করালেন—শেষে কী আছে কপালে কে জানে। জাতকুল না জানলে বাপ পিতামহের নাম না শুনলে কার মেয়ে, বিয়েই বা করে কে। মনের কথা চেপে রেখে মা কাজ করে চলেন নিয়মিত। দিন কাটে, শিবরানীর পড়া এগোয় স্কুলে। জমিদার বাড়ি নূতন উৎসবের পালা পড়ল; বৌরানীর খুকি হয়েছে আজ কয়দিন। ঢাক ঢোলের বাদ্য তেল হলুদের ছড়াছড়ি গ্রাম জুড়ে। বৌরানী অপারগ হয়ে আই এ পাশ শিক্ষয়িত্রী এনেছেন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস করে। উঠে হেঁটে বেড়াতে পারলেই আবার তিনি স্কুলে যাতায়াত শুরু করবেন ভেবে রেখেছেন।

ছয়

বছরখানেক ধরে বৌরানী বড়ো একটা মঞ্জুকুঞ্জে যেতে পারেন না—শরীর খারাপ। একলাই রূপেন্দ্রনারায়ণ আজকাল বন্ধুদল নিয়ে মঞ্জুকুঞ্জে হৈ চৈ করে হপ্তা কাটান। দেওয়ানজির কল্পনা এক্ষেত্রে ব্যর্থ। ভেবেছিলেন—কাজের দিকে মন ফেরালে রাজাবাবুর খরচ

করা ধাতটা হয়তো কিছু বদলাবে। কিন্তু কাজে তা হোলো না। এদিকেও খরচ ওদিকেও খরচ। শহরে গেলে খরচা আরো চতুর্গুণ। দেনা দাঁড়িয়েছে, গিন্নিমা বৌরানী জানতে পারেন না; কথাটা দেওয়ানজি চেপে রাখেন। মঞ্জুমালিকা আজকাল স্বামীকে ঘরে পান না সব সময়ে। খুকিকে কোলে নিয়ে আদর করে ভুলে থাকতে চেষ্টা করেন—সফল হন না। বলা চলে না কোনো কথা, তাতে মেজাজ খারাপ হয় আরও বেশি স্বামীর।

খুকির অন্নপ্রাশন; রাশির যোগে গিন্নিমা নাম রাখলেন রাসেশ্বরী—মঞ্জুমালিকা বড়ো সাধে নাম দিলেন পুষ্পকলিকা, পুষু হোলো খুকির ডাক নাম। রাজাবাবু ধুম লাগালেন, বন্ধুদল নিয়ে বাড়িতে। গিন্নিমা করলেন কাঙালী বিদায়, বৌরানী খাওয়ালেন, নূতন কাপড় দিলেন স্কুলের ছাত্রীদের—রাজাবাবু নাচ-তামাশার বহর বাড়ালেন অতিমাত্রায়। দেওয়ানজি কূল পান না কোনোদিকে। আজন্ম এই পরিবারের খেয়ে তিনি মানুষ; পরিবারটা আজ ডুবতে বসেছে; দুর্ভাবনায় তাঁর ঘুম হয় না রাতে।

সরস্বতী পূজা, স্কুলের ছাত্রীরা পূজার আয়োজন করেছে। শ্বেতপদ্মে আসীন, সুন্দর সরস্বতী মূর্তি সামনে রেখে তারা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে বাসন্তী রংয়ের শাড়িপরা। বৌরানীকে সামনে না রেখে তারা অঞ্জলি দিতে চায় না। শিক্ষয়িত্রী শিবরানীর দিকে চেয়ে বললেন, যাও তো শিবু, বৌরানীকে ডেকে আনো।

ষোলো বছরের শিবরানী সোনাঢালা রং, কৈশোরের কান্তিটুকু দেখা দিয়েছে দেহেমনে অপূর্ব সুন্দর হয়ে। পিঠ ছেয়ে ছড়িয়ে আছে কালো চুলের রাশ। স্নান করেছে সকল মেয়ে সকালে উঠে। ভিজে চুলে ফুল পরেছে এবাড়ি ওবাড়ি থেকে সংগ্রহ করে। বাসন্তীসজ্জায় সজ্জিত বীণাপাণির এই ক্ষুদ্র বাহিনীটি যেন বীণাঝংকারে বেজে উঠবে বাণীর বরে। আলপনা চিত্রে চিত্রিত উঠান খানির সজ্জাও

কম নয়।

দেউড়ি ছেড়ে তিনটি উঠান পেরিয়ে শিবরানী চলল বৌরানীর মহলে। বৌরানী আছেন শোবার ঘরে ; দরজায় পৌঁছে কার গলার স্বর শুনে শিবরানী থমকে দাঁড়াল।

—না গেলেই নয় ?

—দরকার আছে, যেতেই হবে।

—পূজার দিন ছেলেরা তোমাকে চায় ; চলে গেলে দুঃখ পাবে উৎসাহহীন হবে।

—যাবার সময় যাব দেখা করে।

—থেকেই যাও না আজকার দিনটা।

—সে আর হয় না—সেখানে অনেকগুলো এনগেজমেণ্ট আছে।

—আমার একেবারেই ভালো লাগবে না।

—পরশু ফিরব, দেরি হবে না।

রূপেন্দ্রনারায়ণ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে দরজার সামনে শিবরানী দাঁড়িয়ে—কী রূপোজ্জ্বল মূর্তি। বিস্ময়মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন রূপেন্দ্র-নারায়ণ—বুঝলেন, স্কুলের ছাত্রী—জিজ্ঞাসা করলেন—

—তোমার নাম কী।

—শিবরানী—

—থাকো কোথায়।

—দক্ষিণ পাড়ায়।

—স্কুলে পড়ো বুঝি ?

—হাঁ—

—কী চাও।

—বৌরানীকে নিয়ে যাব।

—ঘরে আছেন—গিয়ে বলো।

শিবরানী ঘরে গিয়ে ঢুকল। রূপেন্দ্রনারায়ণ এগিয়ে চললেন বাইরের

ঘরে।

বৌরানী খাটে বসে, মুখখানি একটু লাল, চোখ দুটিতে জলের রেখা। প্রণাম করে রানী বলল—বৌরানী মা, মেয়েরা, দিদিমণিরা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি গেলে অঞ্জলি দেবেন।

—চলো—ব'লে মুখে একটু জল দিয়ে চললেন বৌরানী শিবুর সঙ্গে স্কুলবাড়ির দিকে।

ভরা উৎসাহে বাণীর পূজা হোলো শেষ। জলযোগে তৃপ্ত হয়ে মেয়েরা কতক গেল বাড়ি—বড়োরা শিক্ষয়িত্রীরা রান্নার কাজে লাগলেন, রাতে খাওয়া। মেয়েরা অভিনয়ও করবে "গুরুদক্ষিণা"।

সন্ধ্যায় শোনা গেল রাজাবাবু আজ কলকাতায় যান নাই। মেয়ে-স্কুলের ছাত্রীদের অভিনয় দেখতে চান—বৌরানীকে বললেন। রাজাবাবু রয়ে গেলেন, বৌরানীর বুকটা আনন্দে ভরে উঠেছে। অভিনয়ের ছাত্রীদের সাজাচ্ছেন নিজহাতে সুন্দর করে।

অভিনয় হোলো মন্দ নয়, আবৃত্তি গান বালিকাদের মুখে মিষ্টি শোনাল। রূপেন্দ্রনারায়ণের দৃষ্টি আবদ্ধ শিবরানীর রূপের দিকে। মনটা উন্মনা।

রাতে বৌরানীকে বললেন—তোমার ঐ সুন্দরী ছাত্রীটি কোথাকার মেয়ে।

—এই গ্রামেই থাকে—মেয়েটি খুব ভালো, দুবছর পড়েছে এতেই অনেক শিখেছে। দেখলে তো কেমন আবৃত্তি করল। গান গাইল!

—হুঁ—

সাত

পাবলিসিটি অফিসার সুবরেণ্য চৌধুরীর গ্রামে প্রতিপত্তি খুব। তাঁর বিদ্যা গুণের সমজদার জুটেছে অনেকগুলি। তাদের আগ্রহ ও কাজের সুফল দেখে কর্তৃপক্ষকে লিখে তিনি আরো তিনমাস সময়

বাড়িয়ে নিলেন সেখানে থাকার। কাজ করে নিজে আনন্দ পান, লোকগুলিও সন্ধান পায় নূতন নানা কাজের। নূতন ধাঁচের তাঁত বসেছে গ্রামে কয়েকখানি। গাই গরু ও বলদগুলির পুষ্টি সাধন করতে শেখাচ্ছেন তিনি নূতন প্রণালীতে। চাষের জমিতে ফসল ফলাবার জন্য সার তৈরির ব্যবস্থা দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিক কৌশলে। নূতন কথা শুনলে, নূতন কিছু দেখলে মানুষের আনন্দ না হয়ে পারে না। সবাই উৎসুক নূতন কিছু শিখতে।

বক্তৃতার সঙ্গে হাতে কলমে কাজ দেখিয়ে চৌধুরী চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছেন গ্রামের লোকের। ক্ষেতে গিয়ে তিনি নিজের হাতে বীজ ছড়ান, চাষীরা অবাক হয় তার অভ্যস্ত হাতের কায়দা দেখে। শিক্ষিত লোকের চাষ-আবাদে নজর চাষীরা পূর্বে দেখেনি কোনো দিন। তারা জানে গেঁয়ো চাষার কাজ কলম ধরা লোকেরা হাতে ধরে না। কাজের মধ্যে দিয়ে এঁ-কে যেন তারা নিজের মধ্যে আঁকড়ে পায়। চাষার ঘরে ভাতও খান তিনি দুপুরে অনেক সময়। রাতের খাওয়াটা পয়ামাসির কাছে থাকে ঠিক।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে চৌধুরী স্টোভে তৈরি গরম চা খান দুএক পেয়ালা ; একটু আরাম করে বসে খেতে খেতে দেরি হোলে পয়ামাসি ডাকতে আসে। খবর জানে, খেটে খেটে বাবু হয়রান হন খুব—বলে, বাবু, তোমার এত কাজ।

—কাজ না করলে চলে কি পয়ামাসি। অনেক খাটতে হবে তবে দেশের কাজ এগোবে।

—মা বলেন, ছোটোবড়ো সকল কাজে চৌধুরীবাবু তৎপর, কোনো কাজে হটেন না। ভদ্রলোকের ছেলে, বাবুগিরি নাই এতটুকু। মায়ের মুখে তোমার যশ ধরে না ; বড়ো পছন্দ তোমাকে তাঁর।

—মায়ের মতো গুণবতী দুর্লভ ; এতটুকু স্খলন নাই কোনোখানে ; আলগা কথা একটা মুখে শুনি নাই কোনো দিন, মা খুব পরি-

শ্রম করেন না পয়ামাসি ?

—হাঁ খুব, এক মুহূর্ত বসেন না ; রানীও আমাদের মায়ের মতোই, —খাটে খুব ; সারাদিন স্কুলে পড়াশুনা—রাত জেগে মায়ের সকল কাজে সাহায্য করে ষোলো আনা। রূপের ডালি মেয়ে—একমাস বয়স থেকে আমি তাকে হাতে করে মানুষ করেছি। বড়ো মায়া আমার বাবু তার উপরে। নাম তার শিবরানী, জানো তো বাবু ?

চৌধুরী সে কথায় জবাব না দিয়ে বললেন—মায়ের বুঝি ঐ একটি মেয়ে ?

—হাঁ—ওকেই ছয় বছরেরটি নিয়ে আমরা এ গ্রামে এসেছি। বাবু যে কোথায় গেছেন, কেউ তা জানে না। তাঁর খবর নাই অনেক কাল। মায়ের বুদ্ধিতেই এ সব কিছু চলছে।

চৌধুরী একটু চমকে গেলেন ; বুঝলেন এদের মধ্যে একটা কিছু যেন চাপা আছে। মুদি চাষির ঘরে এমনতরো কেতাদুরস্ত ভদ্র-ছাঁদের চালচলন তো দেখা যায় না। মনের কথা মনে রেখে তিনি বললেন—চলো পয়ামাসি, খেতে যাওয়া যাক।

বাড়ি ঢুকে চৌধুরী দেখলেন, শিবরানীর মা উঠানে দাঁড়িয়ে কার যেন অপেক্ষা করছেন। তাঁকে দেখেই বললেন—খুকির আজ বিকাল থেকে জ্বর এসেছে ; সন্ধ্যার পরে বেড়েছে। আপনার কাছ থেকে একটু হোমিওপ্যাথি ওষুধ নেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। আপনি হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন ভালো।

—চলুন,—দেখে আসি—

—আগে খেয়ে নিন।

—রোগী দেখে ওষুধ দিয়ে স্থির হয়ে খাব।

—আপনাকে ব্যস্ত করলাম না তো ?

—কিছু মাত্র না।

ছোকরা চাকর সামনে ছিল তাকে বললেন,—যাও তো আমার বাড়ি থেকে ওষুধের বাক্সটা নিয়ে এসো।

প্রয়াগী বলল—ও আবার ওষুধের বাক্স চিনবে? শিশি সাজানো ওষুধের বাক্স আমি চিনি। আনছি—ব'লে সে চৌধুরীর বাসার দিকে চলল।

সুবরেণ্য মায়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন রোগী দেখতে; জ্বর খুব—গা জ্বালা, মাথা ব্যথা, উপসর্গ তো আছেই। হাত দেখে জ্বরের গতি ইত্যাদি পরীক্ষা করে ঔষধের ব্যবস্থা করলেন, ইতিমধ্যে প্রয়াগী বাক্স এনে হাজির। একবার ওষুধ খাইয়ে ত্বুবারের রেখে চৌধুরী বেরিয়ে এলেন, বলে এলেন,—কাল সকালে খবর দেবেন, কেমন থাকেন।

খাওয়া সেরে বাসায় গিয়ে মা মেয়ের কথাটা চৌধুরীর মাথায় কেমন ঘুরতে লাগল। কে জানে এরা কোথাকার মানুষ, কী পরিচয়ে এখানে বাস করছে, মুদির দোকান চালায় বটে কিন্তু জাতে মুদি একথা বলতে তো কাউকে শোনা যায় না। পাড়ায় এদের সুস্পষ্ট পরিচয় কারো জানা নাই, ছয়মাসে এটা তিনি বুঝেছেন। মায়ের প্রতি কথায় ব্যবহারে একটি বিশিষ্ট সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠে। মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী—এরা বড়ো ঘরানা না হয়ে যায় না। কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া হোতে লাগল অনেকক্ষণ। পরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরে উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে রোগী দেখতে চললেন চৌধুরী ওষুধের বাক্স হাতে ঝুলিয়ে। মস্ত বড়ো হাতল দেওয়া মজবুত চামড়ার বাক্সটি নতুন আমেরিকার আমদানি। দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন—পয়ামাসি, বাড়ি আছ। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বুড়ো ঝি প্রয়াগী বেরিয়ে বলল—আসুন বাবু আসুন; মা আপনার পথ চেয়ে আছেন। রানী একটু ভালো আছে, তবে জ্বরটা একেবারে ছাড়েনি।

মা এসে চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঘরের ভিতর। শিবরানী তক্তায় শুয়ে, গলাপর্যন্ত একখানি বালাপোষ দিয়ে ঢাকা একরাশ চুলের লম্বা বিনুনি বালিশের ওপর দিয়ে তক্তা ছাড়িয়ে ঝুলছে। জ্বর ছাড়েনি, মুখ তখনো থমথমে। তক্তার পাশে একটি বাঁশের বড়ো মোড়ায় বসলেন চৌধুরী ; নাড়ী টিপে, রাতের অবস্থা জেনে, উপসর্গের লক্ষণ বুঝে নূতন ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। পথ্য বার্লির জল, মিশ্রী, পাওয়া গেলে দুচার কোয়া কমলালেবু দিতে পারা যায় —সন্ধ্যায় খেতে এসে আবার দেখে যাব বলে উঠে পড়লেন। তাঁর অনেক কাজ সময় দিতে পারেন না একটা কাজে বেশি। মা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখলেন ?

—কম আছে, এখনো তিনচার দিন লাগবে।

সাতদিনে শিবরানী সম্পূর্ণ সেরে উঠল। আরো হপ্তাখানেক কেটে যাবার পর মা একদিন চৌধুরীবাবুকে বললেন, কাল দুপুরে আপনার নিমন্ত্রণ আমাদের বাড়ি। আমরা ব্রাহ্মণ, ভাত খেতে ভয় পাবেন না আমাদের হাতে।

—আমি দুবেলা চাষার অন্ন গ্রহণ করে থাকি ; আমার আবার জাত বিচার। ব্রাহ্মণের ছেলে বটে কিন্তু নিজেরা ছিটকে পড়েছি অনেক দূরে। কাজ করা যায় না বেশি জাত বাঁচালে।

মা বুঝলেন, চৌধুরী ব্রাহ্মণের ছেলে ; চৌধুরী বুঝলেন এরা ব্রাহ্মণ পরিবার। উভয়ের মনটা কেমন সাড়া দিল এই পরিচয়ে।

পরদিন রান্না করলেন মা অনেক পদ। সিন্দুকে তোলা পুরোনো একখানি শ্বেত পাথরের থালা বের ক'রে অন্ন সাজালেন পরিপাটী করে। বাটির ব্যঞ্জনও অনেকগুলি। পায়স পিঠে আগের রাতে করে রেখেছেন, রান্নাঘরের তাক্এ তোলা সেগুলি যত্ন করে।

খেতে বসেছেন চৌধুরী, মা কাছে বসে খাওয়াচ্ছেন। অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা, পরিবেশনের পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতায় উন্নত রুচির পরিচয়

পেয়ে একদিকে তিনি যেমন পরিতৃপ্ত হলেন তেমনি দৃঢ় হোলো যে নিশ্চয়ই এরা বনিয়াদি বংশ।

রোগী দেখতে যখন তিনি ঘরে ঢুকতেন দেওয়ালে একখানি ফটো টাঙানো দেখেছিলেন এক ভদ্রলোকের—সুন্দর—সুপুরুষ। অনেক-বার মনে হয়েছে, হয়তো বা ইনিই মেয়েটির বাবা। খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে, মা ডাকলেন—রানী, পিঠা পায়সের বাটি তুটি নিয়ে আয়। রেকাবিতে রসবড়া সরুচাকলি আছে তাও আনিস।

হেঁটমুখে শিবরানী পিঠে পায়সের রেকাবি বাটি এনে পাতের কাছে নামিয়ে দিল। মা বললেন, মশলা ঠিক করে রাখিস। শিবরানী ঘরে গেল, কৌটায় মশলা ভরে আনতে। মা বললেন—আপনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা আছে, অবসর মতো বলব।

—কাল আসব বৈকালে।

আট

ভাগ্যস্থানে যখন কুগ্রহ ভর করে তখন কুপরামর্শ দিতে, কুবুদ্ধি জোগাতে কুলোক জড়ো হয় মানুষের চারিপাশে, অনেক। ঘিরে ফেলে তাকে শনির শ্যেনদৃষ্টি।

রূপেন্দ্রনারায়ণের ভাগ্যফলে শনি ঘনিয়ে এসেছিল সে সময় ষোলো আনা। শিবরানীর কৈশোর লাবণ্য তার মনকে বিকৃত করে তুলে-ছিল দিনে দিনে। ঠাট্টা তামাশা হাসি আলাপে কুবন্ধুরা কুবুদ্ধি জোগাচ্ছিল অহরহ। প্রশ্রয় পাচ্ছিল মনটা তার পাপের পথে। চিন্তা বিক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট কোনো কাজ হাতে নাই যাতে মনোনিবেশ করে মনকে বাঁচাতে পারে আপদ থেকে। সঙ্গীরা শপথ করে শোনায় ভয় নাই এ কাজে এতটুকু। মেয়েটির যাতায়াতের পথে তারা দৃষ্টি ফেলে প্রতিদিন। এলোমেলো ভাবে নানা কৌশল মনে আসে ওকে হস্তগত করার। ভদ্র সন্তান, ভরসা পান না অতিগর্হিত কাজে প্রবৃত্ত

হওয়ার। বুদ্ধি দিলেন এক বুদ্ধিমান বন্ধু, গোপনে বিবাহ করে ফেলুন না রাজাবাবু, সব গোল মিটে যাক—। ধনী লোকে ধনের দৌলতে কত কী করে। কথাটা রূপেন্দ্রনারায়ণের মনে লাগল। অনেক যুক্তি খাটাতে লাগলেন নিজের মনে এর পক্ষে। শেষে স্থির করলেন, চিরহিতাকাঙ্ক্ষী পরিবারের পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারী সদাশয় মহাপ্রাণ দেওয়ানজির শরণাগত হওয়াই কর্তব্য। দেখা যাক তিনি কী বলেন।

দুপুরে খাওয়া সেরে বৈঠকখানায় ফরাশ বিছানায় শুয়ে আছেন রূপেন্দ্রনারায়ণ একা। জানালা দরজা বন্ধ, ঘরখানি ঝাপসা অন্ধকারে ঢাকা। গরম হাওয়া চলছে বাইরে। হাজির-থাকা চাকরকে ডেকে বললেন, দেওয়ানজিকে খবর দে তো হরিধন। হরিধন ছুটল কাছারি ঘরের দিকে। দেওয়ানজি বসে কাগজপত্র দেখছেন, হরিধন ঢুকে বলল, রাজাবাবু খবর দিয়েছেন দেওয়ানজি।

—বলো, আসছি—ব'লে তিনি দরকারি কাগজগুলি তুলতে লাগলেন হাত বাক্সে। হরিধন দৌড়ে চলল দেওয়ানজির আসার খবর দিতে। মিনিট কয়েক পরে দেওয়ানজি এলেন রাজাবাবুর ঘরে। অন্ধকারে রাজাবাবুর মুখ দেখা যায় না স্পষ্ট।

—বসুন দেওয়ানজি—আপনার শরীর ভালো আছে তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বিষয় কর্মের ব্যবস্থাদি চলছে কেমন।

—ভালো নয়, মহালে আদায় কম, ব্যাঙ্কে দেনা চেপেছে অনেক। গত সনে উস্‌মুলপুরের জমিদার বাবুদের কাছে ধার-নেওয়া লক্ষ-টাকার সুদ দেওয়া হয় নি আদৌ, আসল শোধ তো দূরের কথা। খরচ কমানো দরকার, বাজে লোক বেশি না পুষলেই ভালো হয়।

—ভাবছি, ওদের অনেকগুলোকে এবার বিদায় করে দেব : আমাকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে সে একমাত্র আপনি দেওয়ানজি। আমি

থামাতে পারিনে নিজেকে কোনো কিছু থেকে। সামলাতে পারিনে ঝোঁক একবার চেপে পড়লে। একটা দুঃসাহসিক কাজের কথা বলতে চাইছি, ভয় পাবেন না—না শুনে। থামাতে যাবেন না দেনার ফর্দ দেখিয়ে, তর্ক তুলে বোঝাতে যাবেন না ;—দোহাই আপনার। মনটা আমার ভরে উঠেছে একটা অস্বাভাবিক ভাবে কিন্তু তাড়াতে পারার উপায় নাই তাকে সোজা পথে তার প্রতিকার না করে।

—বলুন রাজাবাবু, কী চান আপনি ; আমি এ পরিবারের অন্নে চির প্রতিপালিত। আপনার কল্যাণের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত সর্বদা।

—দেওয়ানজি, আমি বিবাহ করতে চাই।

—বি-বা-হ।—আপনার ?

—হাঁ—সে কি এমনই অসম্ভব।

—অসম্ভব—নিতান্ত অসম্ভব।

—কেন। অসম্ভব কিসে। পুরুষের একাধিক বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

—কলির শেষে পৃথিবী উলটাবে—এটাও শাস্ত্রবাক্য। পৃথিবী উলটালে তার বিধিগুলি খাড়া হয়ে থাকতে পারবে কি সোজা। কলি শেষ হয়েছে, পৃথিবী বদলাতে শুরু করেছে। সূক্ষ্ম গতি তার চোখে পড়ে না, সকলের—

—আপনিও পাগল হোলেন দেখছি দেওয়ানজি, আমার সঙ্গে। পৃথিবী উলটাচ্ছে কোন্ দিকে। কলি শেষ হবে কখন। এসব প্রলাপোক্তিতে কী প্রয়োজন। ব্যবস্থা করুন, এই চাই—।

—বৌরানী মার গলায় ছুরি বসাবেন কোন সাহসে।

—তাঁর এতে কোনো কষ্ট হবে না ; বিবাহ গোপনে হবে, গোপনে থাকবে চিরদিন। এ ঘরে তাকে আনা হবে না কোনোদিন কখনো।

—পাগলের কাণ্ড। এ কথা কে আপনার মাথায় দিয়েছে।

—কেউ নয়—আমি স্বয়ং।

—কার মেয়ে। কোথায় থাকে। খোঁজ দিলে কে।

—নিজের চোখ খুঁজে বের করেছে—গ্রামের মেয়ে স্কুলের ছাত্রী—সন্ধান করতে যেতে হয়নি কোনোখানে। নামটা আপনার কাছে বলতে মুখে বাধে। আপনি আমার পিতার তুল্য, বলুন কী উপায়।

—সর্বনাশ রাজাবাবু, ছেড়ে দিন ওকথা মন থেকে।

—অসম্ভব।

—ঘটানো আরো অসম্ভব।

—আপনি মনে করলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, আপনার বুদ্ধিতে অসাধ্য সাধন হয়।

—সাধ্য নাই রাজাবাবু।

—আপনি উপায় না করলে আমাকে বিষ খেয়ে জীবন শেষ করতে হবে। বংশ লোপ হবে পূর্বপুরুষের নাম ডুববে—আপনি কি সেটা দাঁড়িয়ে দেখবেন।

—রাজাবাবু আমাকে অবসর দিন, বৃদ্ধ হয়েছি। নূতন লোক নিযুক্ত করুন কাজে।

—আমাকে মৃত্যুমুখে তুলে দিয়ে আপনি চলে যেতে চান। বাঁচাতে হবে আমাকে সেটা ভুলে যাবেন না। সময় দিলাম তিন দিন, ভেবে দেখবেন,—আজ আমি কলকাতা যাচ্ছি, সাতদিন পরে ফিরব। এর মধ্যে একটা বুদ্ধি ঠাউরে রাখবেন।

বেলা তিনটা, রাজাবাবুর মোটর চলে গেল কলকাতার দিকে। সন্ধ্যার পূর্বে বৌরানীর মহলে দেওয়ানজি উপস্থিত হলেন; মনটা চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

পুরাতন ঝি রানীমাকে খবর দিল, দেওয়ানজি এসেছেন, দেখা করতে চান। বৌরানী তৎক্ষণাৎ উঠে বাইরে এলেন। শয্যায় শুয়ে

ভাবছিলেন কত কী—মনটা তাঁর অস্বস্তিতে ভরা। দেওয়ানজি নমস্কার জানিয়ে বললেন—

—রানীমা, সমূহ বিপদ—তৎপর হয়ে প্রতিকার করা দরকার।

—বিপদ ? কিসের—কার। কী করতে হবে দেওয়ানজি।

—বিপদ সকলের—আপনার, আমার, পরিবারের, গ্রামের। ভয়ে বিস্ময়ে বৌরানী বললেন, গুরুতর বিপদ নাকি। আমা হতে তার কী প্রাতকার হোতে পারে। আপনি পরিবারের পিতৃ-স্থানীয়। আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করবে কে। যা বলেন তাই করতে আমি প্রস্তুত।

—এখনি যেতে হবে আপনার স্নেহপাত্রী স্কুলের ছাত্রী শিবরানীর বাড়ি। সরাতে হবে তাদিকে গ্রাম থেকে এই দণ্ডে। অমঙ্গলে ঘিরছে তাদিকে—আপনাকে। সব দিক রক্ষা হবে তারা সরে গেলে।

বৌরানীর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল মুহূর্তে। হাত পা কাঁপছে; দেওয়াল ধরে দাঁড়ালেন।—চলুন মা, গাড়ি দাঁড়িয়ে দেউড়িতে। সব আমি প্রস্তুত করে রেখেছি।

পাঁচ মিনিটে মোটর এসে পৌঁছল জলপানের দোকানের সামনে। দেওয়ানজি নেমে খবর দিলেন—রানীমা এসেছেন, ভিতরে যাবেন। পলকে পয়মাসি দরজা ঠেলে বাড়ি ঢুকে উঁচু গলায় ডাক দিল,—রানা, দৌড়ে আয়, দেখ্ এসে কে এসেছে।

জানলা দিয়ে মা দেখলেন জমিদার বাবুর বড়ো মোটর বাড়ির সামনে। পথে দেওয়ানজি দাঁড়িয়ে। গাড়ির ভিতরে বসে বৌরানী-মা।

মা-মেয়ে দুজনে দৌড়ল গাড়ির দিকে। হাত ধরে নামালেন মা বৌ-রানীকে একান্ত যত্নে, সমাদরে। শিবরানী লুটিয়ে রানীমার পায়ে প্রণাম করল অন্তরের সব ভক্তিটুকু দিয়ে। তাঁর বিবর্ণ মুখখানির দিকে নজর পড়ল না তাদের—ব্যস্ত থাকায়।

দাওয়ায় এনে বসালেন আসন পেতে দেওয়ানজিকে। মোড়া দিলেন বৌরানীর জন্য, এই তাঁদের আসবাব। বৌরানীর আগমন একুটীরে আকস্মিক ব্যাপার। মনটা তাদের গুছিয়ে নিতে সময় লাগল একটু।

দেওয়ানজি শিবরানীর মাকে বললেন, আপনার সঙ্গে আড়ালে আমার কিছু কথা আছে। সরে গেলেন দুজনে পয়ামাসির রাতে-শোবার ছোটো ঘরখানার দিকে।

দেওয়ানজি বললেন—অমঙ্গলের আভাস জানাচ্ছি। প্রশ্ন করবেন না একটিও। বুকপকেটে রাখা নোটের তাড়া বের করে বললেন, নিন এই হাজার টাকার নোট। গ্রাম ছেড়ে চলে যান কালই।

শিবরানীর মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। অনুমানে অনেকটা বুঝতে পারেন। আপনার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, কাল সন্ধ্যার পূর্বে আমি দূর গ্রামে চলে যাব নিশ্চিত।

দুটি কথায় কাজ শেষ। অন্তরের আশীর্বাদ জানিয়ে দেওয়ানজি হলেন অগ্রসর রাস্তার দিকে, মুহূর্ত দাঁড়াবার যেন ইচ্ছা নাই।

শিবরানীর হাত ধরে বৌরানীও এগোলেন পিছু পিছু। মোটর হোলো অদৃশ্য।

মা দেখলেন, মেয়ের হাতে দুগাছি নতুন বালা পরানো। মেয়ে বলল, মা বৌরানী আমাকে নিজের হাতের বালা দুগাছি খুলে পরিয়ে দিলেন। তাঁকে বড়ো অসুস্থ দেখাচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না কিছু।

নয়

বিকালে আসব—ব'লে চৌধুরীবাবু সেই যে গেছেন পনর দিন আর দেখা নাই। সেদিন বাড়ি ফিরে কর্তৃপক্ষের "তার" পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে দূর গ্রামে কাজে চলে যেতে হয়েছিল। কাল রাত্রে ফিরেছেন—পয়ামাসি খবর জেনে এসেছে। আজ রাতে খেতে আসবেন তিনি যথা সময়ে, তাও পয়ামাসিকে বলেছেন। শিবরানীর মা উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে বললেন—যা তো প্রয়াগী শীঘ্র চৌধুরী বাবুকে ডেকে আন্। ঘণ্টা খানেক পরেই তিনি আসতেন—ডাক শুনে তাড়াতাড়ি চলে এলেন।

—আজ রাতেই আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চাই। সে বিষয়ে আপনার কোনো সাহায্য পেতে পারি কি।

—নিশ্চয়—যাবেন কোথায়।

স্থিরতা নাই—বেরিয়ে পড়ি তো এখান থেকে।

—আজ ভোরের ট্রেনে আমাকে বাড়ি যেতে হবে, সাতদিনের ছুটি। সেখান থেকে বোম্বাইএ পাঠাচ্ছে আট মাসের জন্য। ইচ্ছা হোলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আমি নামব কৃষ্ণনগর স্টেশনে। আপনারা কোথায় উঠতে চান।

—কোনো দোকানে—চটিতে ; পরে বাসা দেখে নেব।

—চলুন। সেখানে আমার এক বন্ধুর বাসায় রাতটা আপনাদের রাখতে পারি। পরদিন দেখে শুনে অনায়াসে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব। স্থানটা আমার বিশেষ পরিচিত। ছয় বৎসর আমি ঐখানকার কলেজে পড়েছি।

—কারো বাসায় উঠবার ইচ্ছা আদৌ নাই! দোকান দেখিয়ে দেবেন, সেখানেই রাতটা কাটাব। পরদিন বাসা খুঁজে নেবার ভার আমার নিজের। লোক-সংসর্গে থাকতে আমি নারাজ।

—বেশ, তাই হবে।

সারারাত জেগে মা-মেয়েতে দুটি ট্রাঙ্ক একটি হাত বাক্স গুছিয়ে পয়ামাসিকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন চৌধুরী বাবুর সঙ্গে, ভোরের শুকতারা সবে দেখা দিয়েছে তখন। পাড়ার কেউ জানল না—কখন গেলেন, কেন গেলেন।

সকালে উঠে সবাই দেখে দোকানখানা বন্ধ। বড়ো একটা বন্ধ তালা ঝুলছে সদর দরজার কড়ায়।

রাত্রি নয়টায় কৃষ্ণনগর স্টেশনে ট্রেন পৌঁছল। স্টেশনের ধারে একখানি ছোটো বাড়ি, সামনে লেখা, "ভাড়া দেওয়া যাইবে।"

চেনা চৌকিদারকে ডেকে চৌধুরী বললেন, বাড়িটা ভাড়া নেব, চাবি খুলে দাও।

চৌধুরীকে চেনে চৌকিদার খুব। তৎক্ষণাৎ বাড়ি খুলে কুলীর মাথায় মালপত্র সমেত যাত্রীকয়জনকে বাড়ি ঢোকাল। পাশের বাড়ি থেকে জ্বালানো লণ্ঠন একটা এনে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

স্বতন্ত্র একখানি বাড়ি পেয়ে মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। জল-স্পর্শ না করে পয়ামাসিকে নিয়ে একঘরে তিনজনে শুয়ে পড়লেন। চৌধুরী গেলেন নিজের বাসায়।

পরদিন ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ব্যবস্থা হয়ে গেল বেশ। যেখানে পয়া-মাসি সেখানে অভাব অসুবিধা থাকতে পারে না বেশিক্ষণ।

চৌধুরী খবর নিতে এসে দেখলেন, এঁরা গুছিয়ে বসেছেন দিব্যি। কারো সাহায্য দরকার করে না।

মনে মনে মাকে প্রশংসা না করে পারলেন না। আত্মনির্ভরপরায়ণা নারী বটেন ইনি।

চৌধুরীর প্রতি মায়ের মমতা তাঁর মনকে স্নেহে জড়িয়ে ফেলেছে অনেকখানি। অন্তরে একটা অজানা আনন্দ জাগে এঁদের সংসর্গে। শিবরানীর সঙ্গে কথা বলেন না তিনি কোনো দিন; কেমন যেন

বাধে। ছ'মাইল দূরে চৌধুরীর নিজের বাড়ি। বৃদ্ধা মা থাকেন গ্রামের বাড়িতে, বিদেশ যাওয়ার আগে তাঁকে দেখে যেতে হবে। আজই বাড়ি যাওয়া চাই, সময় কম। শিবরানীর মা চৌধুরীকে গোপনে বললেন,—সেদিন বলতে যাওয়া কথাটা চাপা পড়ে গেছে। আপনার গ্রামান্তরে যাওয়া, ফিরে আসা—কেটে গেছে একপক্ষ। আমাদের প্রচ্ছন্ন জীবনকথা জানাতে চাই আপনাকে। কত বড়ো বংশ আমাদের বলামাত্র বুঝবেন। আমার স্বর্গীয় শ্বশুরের নাম না জানে কে। তাঁর একমাত্র ছেলে শিবরানীর বাবা হাইকোর্টের উকিল। দশখানা পৈতৃক বাড়ি কলকাতায়। ভাড়া উঠত মাসে তুহাজার, ব্যাঙ্কে জমা ছিল কয়েক লক্ষ টাকা, নিঃশেষ হয়ে গেল সব অল্প কয়েক বৎসরে—ঘোড় দৌড়ে, জুয়ার নেশায়। দলের লোক জড়িয়ে ফেললে নানান ফ্যাসাদে, শেষে সর্বস্বান্ত একদিনে। জেলের ভয়ে পালাতে হোলো রাতারাতি। বলে গেলেন অজানা গ্রামে নাম লুকিয়ে থাকো গিয়ে—ভরসা রাখো নিজের উপর। দেখি কতদিনে কী উপায়ে ফিরতে পারি। সে আজ বারো বৎসরের কথা। একযুগ. আর কত অপেক্ষা করা যায়! শিবরানীকে কারো হাতে সঁপে দিয়ে প্রয়াগীকে সঙ্গে নিয়ে আমি দেশান্তরে চলে যাব সংকল্প করেছি। ওকে নিয়ে তো পথে চলাফেরা করা চলে না।

সুবরেণ্য থেমে থেকে বললেন,—দিতে পারেন আমার হাতে যদি চান। আমি নিজের মতে চলি, বলি, কাজ করি, যা ভাবি ঠিক তা থেকে কেউ আমাকে নড়াতে পারে না একচুল। মা আছেন, তিনি একান্ত সন্তানবৎসলা। আমার সুখে সুখী হওয়া তাঁর স্বভাব। যেতে হবে বোম্বাই—সাত দিন বাকি। আজই রাত্রে বিবাহ করে আমাকে তাহলে যেতে হয় মায়ের কাছে। মুখাপেক্ষা করার আমার কেউ নাই।

—আমার কে আছে আমি ছাড়া।

যে কথা সেই কাজ। রাত্রে বিবাহ করে সুবরেণ্য চললেন বৌ নিয়ে নিজের গ্রামে মায়ের কাছে।

পয়ামাসি, শিবরানীর মা রইলেন ভাড়াটে বাড়িখানিতে শূন্য মন নিয়ে।

দশ

বৌরানীর বড়ো জ্বর। সেদিন বাড়ি ফিরে বিছানায় পড়ে প্রবল জ্বরে প্রলাপ বকতে লাগলেন। ভোরের সময় তার করলেন দেওয়ানজি রাজাবাবুকে "বৌরানীর জ্বর বিকার—শীঘ্র আসুন।"

তার পেয়ে রূপেন্দ্রনারায়ণের বুকটা কেঁপে উঠল যেন বৌরানী সব জানতে পেরেছেন ভেবে। বড়োদরের নার্স নিয়ে রওনা হলেন তৎক্ষণাৎ। বৃথা ভাবনার সময় নাই এতটুকু, বাড়ি পৌঁছলেন বেলা দু'টোয়, স্নানাহার হয় নাই, মাত্র সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছেন। পৌঁছেই ছুটে চললেন বৌরানীর ঘরের দিকে। অচেতন বৌরানী জ্বরের ঘোরে, গিন্নিমা ব'সে সামনে, পুরোনো ঝি চণ্ডী পায়ের কাছে ব'সে হাত বুলাচ্ছে পা দু'খানিতে। ডাক্তার এসেছিলেন সকালে বলে গেছেন জ্বরটা বাঁকা, বিকার সঙ্গে নিয়ে দেখা দিয়েছে—তিন চার দিন না কাটলে ধরা যাবে না কী ধাতের জ্বর। রাজাবাবুর সঙ্গে ফল এসেছে একঝুড়ি—বেদানা, কমলা, কেশুর, আঙুর, রোগীর খাওয়ার জন্য। আইসব্যাগ ও মণখানেক বরফ সঙ্গে আনতে ভোলেন নি। বিলাতে শেখা পাকা নার্স দুয়েকটি দরকারি ওষুধও এনেছে নিজের সঙ্গে। রাজাবাবুর বুকে ভয়, কী জানি কী হয়। তাঁর পাপের ফল বা ফলে মুহূর্তে।

চিকিৎসা চলল, সাতদিনে জানা গেল জ্বর টাইফয়েড্, ভারি গোছের। বড়ো ডাক্তার আনা হোলো শহর থেকে যাতায়াতে দৈনিক দুশো টাকা ফি; সঙ্গে এল নূতন নার্স পালা করে শুশ্রূষা করবে

ব'লে। রাজাবাবু বৌরানীর কাছে বসে থাকেন দিনরাত, পুষু শোয় ঠাকুমার কাছে, মাকে দেখে যায় দিনে একবার ঝিয়ের সঙ্গে এসে। গিন্নিমা পূজা মানছেন কত ঠাকুরের, মানসিক রাখছেন কালীঘাটের কালী ও বাবা বিশ্বেশ্বরের নামে, স্বস্ত্যয়ন হোম হচ্ছে প্রতিদিন বাড়িতে ; বৌরানী বাঁচলে হয়। দেড়মাস হয়ে গেল জ্বরের বিরাম নাই ; ডাক্তার বলছেন জ্বরের জোর কমেছে বিকার কেটে আসছে, দুর্বলতায় মারা না পড়েন তো বাঁচতেও পারেন। বিকারের ঝোঁকটা কেটে একটু যেন জ্ঞান ফিরেছে, লোক চিনছেন অল্প স্বল্প। রূপেন্দ্র-নারায়ণকে চোখের সামনে রাখতে চান সারাক্ষণ, দেখতে চান বারং-বার। একটু সরলে অস্থির হন। তিন-মাসে জ্বর ছাড়ল প্রথম, ডাক্তার বললেন ঠাঁইনাড়া করা ভালো ; গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে চলুন। বল যেটুকু আছে তাতে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ ঘটবে না। মোটরে ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা বৈ তো নয়, নার্স ডাক্তার সঙ্গে থাকবে।

মঞ্জুমালিকার বাপমায়ের কাছে নিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত হোলো। শ্বশুরের ছোটো বাড়ি এখন আর রাজাজামাই যাওয়ার বাধা হোলো না। সেখানে গেলে খরচও হবে কম, রোগী যত্নও পাবে যথেষ্ট। টাকার ভাবনা রাজাবাবু এখন ভাবতে শিখেছেন। বৌরানীর ব্যায়রাম তাঁর খামখেয়ালি মনে আক্কেল এনে দিয়েছে অনেকখানি। শ্বশুরকে লিখে সব ব্যবস্থা ঠিক করলেন। পনর দিনে সাবধানে বৌরানীকে নিয়ে গিয়ে ফেললেন বাপের বাড়িতে। বাবা মাকে কাছে পেয়ে মঞ্জুর আনন্দ দেখে কে। মায়ের হাতের রান্না পথ্য পেয়ে ও বাবার মুখ দেখে সে বল পেতে লাগল দিনে দিনে।

রূপেন্দ্রনারায়ণ সঙ্গে থাকেন সর্বদা। বর্ষা শেষে ডাক্তারের পরামর্শে কাশী যাবার ব্যবস্থা হোলো। হাওয়া বদলে সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন তাঁদের মত।

সেখানে গঙ্গার উপর বড়ো বাগানবাড়ি ভাড়া নিলেন রূপেন্দ্র-নারায়ণ বৌরানীর জন্য, মা, পুষুকে আনলেন সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাবা বিশ্বেশ্বরের মানসিক শোধের কথা মায়ের মনে জাগছিল সারাক্ষণ। সুযোগ পেয়ে এবার তিনি এ যাত্রায় বিশ্বেশ্বর দর্শন, বহু তীর্থ ভ্রমণ সারবেন সংকল্প ক'রে বেরুলেন—মানসিক শোধের সংকল্প তো আছেই।

দিন দেখে সপরিবারে রূপেন্দ্রনারায়ণ রওনা হলেন কাশী, সঙ্গে বিপদপারের কাণ্ডারী বৃদ্ধ দেওয়ানজি।

এগারো

দুপুর রোদে গ্রামের পথে গরুরগাড়ি চড়ে সুবরেণ্য বউ নিয়ে চলে-ছেন বাড়ির দিকে। বাপের ভিটায় গিয়ে পৌঁছতে সন্ধ্যা হবে; গাড়ির ভিতরে বসে শিবরানী। সঙ্গে একটি ছোটো টিনের ট্রাঙ্কে শিবরানীর খানকয়েক কাপড়। পাশে একটা চামড়ার সুটকেস্ রেখে সামনে বসেছেন সুবরেণ্য। গাড়োয়ান গাড়ি চালাচ্ছে ঢিমে চালে, পথ ফুরোয় না।

শিবরানীর মুখখানি শুকনো, চোখ দুটি জলভারাক্রান্ত, মাকে ছেড়ে এসেছে এ বেদনা তার বুকে সম্পূর্ণ নূতন।

বেদনাভরা হৃদয়ে একটি অনির্বচনীয় আনন্দ জেগেছে যার অনুভূতিও তার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। মনটাকে তার ভোলাবার জন্যে সুবরেণ্য নিজের মায়ের কথা, গ্রামের কথা, পুরাতন ভিটাখানির পুরাতন স্মৃতিগুলির কথা নানাভাবে পাড়লেন তার কাছে।

দিনশেষের সঙ্গে রানীর বিক্ষিপ্ত মনটি ভরে আসতে লাগল একটি মাধুর্যভরা সুষমায়। সুবরেণ্যের স্নেহের স্পর্শ নিবিড় হয়ে এল তার মনের মধ্যে। অজানা আবেগে নিজের হাতখানি ধীরে ধীরে রাখল সে স্বামীর হাতের উপরে একান্ত নির্ভরে।

সদর দুয়ারে গাড়ি পৌঁছাল। আকাশে চাঁদ তারার আলোক ফুটেছে তখন সবে। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন সুবরেণ্য ঝাঁপিয়ে—মাকে দেখবার জন্য কত না ব্যস্ত তখন মন।

সন্ধ্যার আগেই মা দুয়ার বন্ধ করে দেন, শেয়াল কুকুর ঢোকার ভয়, চোরের ভয়ও যে নাই তাও নয়। জোরে জোরে কড়া নাড়ছেন ও মাকে ডাকছেন জোর গলায় সুবরেণ্য—মা মা, দরজা খোলো।

প্রদীপ জ্বালিয়ে মা তখন সবে সন্ধ্যায় বসেছেন। ছেলের গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লেন আহ্নিক ছেড়ে। ব্যস্ত হয়ে দুয়ার খুলে বললেন—কে রে। আমার বরু নাকি। তুই যে এলি খবর না দিয়ে—আয় বাবা—ঘরে আয়।

—গাড়িতে তোমার বউ বসে মা, নামিয়ে আনো।

—বউ, আমার বউ?

—হাঁ, মা, আমি বিয়ে করে তোমার বউ নিয়ে এসেছি। ঘরে তোলো নিজের বউ।

কথা কওয়ার সময় নাই। ছুটে গেলেন মা গাড়ির দিকে। হাত ধরে নামিয়ে নিলেন গাড়ি থেকে শিবরানীকে।

—মা লক্ষ্মী, নিজের ঘরে এসো, তুমি আমার বরুর বৌ, এ বাড়ি এ ঘর তোমার—মা।

শিবরানী ঘোমটা দিয়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলে মায়ের পায়ে—মনে পড়ল নিজের মায়ের পা দুখানি। কোথায় ফেলে এসেছে মাকে তার আজ—কে জানে।

বৌকে উঠানে দাঁড় করিয়ে পুরানো বাক্স খুলে একখানি সেকেলে সোনার পদক বের করে এনে মা বৌএর গলায় দিলেন ঝুলিয়ে। বাতাসা ভেঙে মুখে ধরলেন তার বড়ো আদরে।

—যত আদর সব কেড়ে নিল তোমার বউ—আমি ফাঁকি পড়ব বুঝি। আমার বুঝি খিদে তৃষ্ণা নাই। চারখানা বাতাসা দাও আমাকে

আগে।

মাতুর পেতে বউ বসিয়ে মা আনলেন খানকতক বাতাসা—সন্থ কোটা সরু চিড়ে।

—এই নে বরু—জল খা। এইবার আমি তোদের খাবার জোগাড় করি। অনেক পথ এসেছিস।

শিবরানী শ্রান্ত ; খাওয়া সেরেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘুমে চোখ ভেরে এল সঙ্গে সঙ্গে। মা ছেলেতে দাওয়ায় বসে কথা হচ্ছে।

—বিয়ে করলি, কাউকে জানালি নি বরু, গ্রামের লোকে বলবে কী। ঘোঁট করবে—কার মেয়ে কোন জাতি, কোথা বিয়ে হোলো কে বিয়ে দিল—হাজার কথা তুলবে তারা, জানিস তো।

—ব্রাহ্মণের মেয়ে—বাপের নাম সুবিমল ভট্টাচার্য কলকাতার বড়ো-লোক। পিতামহের নাম জানে সবাই। পুরোহিতে বিয়ে দিল। ব্রাহ্মণ, অগ্নি, শালগ্রাম সাক্ষী। তোমার ছেলে সব করতে পারে। গ্রামের লোক ঠেকাবে সে এক কথায়—দেখে নিয়ো।

ছেলের কথায় মায়ের অগাধ বিশ্বাস। মা জানে বরু আমার যা বলে তাই করে। নিশ্চিন্ত মনে মা শুতে গেলেন।

সকালে উঠে জল খেয়ে সুবরেণ্য গেলেন গ্রামের মাথা মহিম চক্রবর্তীর বাড়ি। বৈঠকখানায় বসে তিনি আলবোলায় তামাক টানছেন, ভারি চালে কথা কইছেন দু'চার জনের সঙ্গে।

প্রণাম করতেই বললেন তিনি,—কী বরু নাকি। কবে এলে। কাজ-কর্ম চলছে কেমন।

—ভালোই, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে বদলি করেছে। সাত দিনের মধ্যে যেতে হবে। আমার বিবাহ হয়েছে তাড়াতাড়িতে গ্রামের সকলকে খবর দিতে পারিনি ! বউ নিয়ে এসেছি বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলে কৃতার্থ হব। বোম্বাইয়ে অনেকগুলি চাকরি খালি আছে ; আপনার ছোটো ছেলে ননী আই-এ পাশ করে বসে আছে, তার জন্য একটা

কাজের চেষ্টা দেখব।

ছোটো থেকে সুবরেণ্য ননীগোপালকে ভালবাসে দু'জনের মন মেজাজ ধাতেও বেশ মিল।

—হাঁ বাবা তাই করো ; ছেলেদের নিয়ে পারা যায় না আজকাল। ননকো' করে পড়া ছেড়ে আমাকে জলে ডুবিয়েছে দেখো না কত-খানি। তুমি তার একটা গতি করে দাও তো বাঁচি। ও বেলা যাব বউমাকে দেখতে। বৌমার বাবার নামটি কী।

—সুবিমল ভট্টাচার্য—নামজাদা লোক কলকাতার।

পাশে-বসা রামতারণ বাঁড়ুজ্যে বললেন, শহরের হাওয়া এসে ঢুকে পড়েছে গ্রামে—গ্রাম বাঁচানো দায়।

ছোটো ছেলে ননীগোপাল কাছে ছিল, বলে উঠল, শহরের বিদ্যা বুদ্ধি গ্রামে এনে না ফেলে, এঁদো পুকুর না ঝালিয়ে, বনবাদাড় না ঝাড়িয়ে, মশামাছি না তাড়িয়ে ম্যালেরিয়ায় মরুক গ্রামের লোক। লোক মরলে গ্রাম বাঁচবে কাকে নিয়ে।

জবাব দিতে না পেরে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন—আর বাবা আজ-কাল গ্রাম শহরে মাখামাখি, তোরা যা বুঝিস তা কর।

শহরের সুখ সুবিধা সব আমরা আনতে চাই গ্রামে, গ্রামের মানুষ গ্রামে থেকে।

কাজ হাসিল করে সুবরেণ্য বাড়ি ফিরলেন। মাকে বললেন, ভাত দাও মা শীগগির, ওবেলা মহিম চক্রবর্তী এসে তোমার বউএর হাতে ভাত খাবেন স্বীকার হয়েছেন।

পাঁচদিন গ্রাম ঘুরে, ছেলেদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে, তাদের কাছে নূতন কাজের কথা ছড়িয়ে সুবরেণ্য বউ নিয়ে রওনা হলেন, মাকে বলে গেলেন আট মাস পরে ফিরব বোম্বাই থেকে। মাইনে বেড়েছে বেশি টাকা পাঠাব, চাকর রেখো একজন মজবুত দেখে।

পথে পয়ামাসি শিবরানীর মাসঙ্গ নিলেন ; কাশীতে নেমে থাকবেন

তাঁরা বছর খানেক। শিবরানীকে পাঠিয়ে দিয়ে মায়ের মন টেকে না বাড়িতে একটুও।

আটমাস বোম্বাইতে কাজের মেয়াদ শেষ করে সুবরেণ্য বাড়ি ফিরছেন। পথে নামলেন শিবরানীর মায়ের খোঁজ নিতে—দেখা করতে। তাঁরা থেকে যাবেন কাশীতে সুবরেণ্যকে ফিরতে হবে কর্মস্থলে কলকাতায়। ননীগোপালের কাজ করে দিতে ভোলেন নি তিনি বোম্বাইয়ে।

কাশীতে আছেন তাঁরা তিনদিন।

বিকেলে বেড়িয়ে সুবরেণ্য বাসায় ফিরেছেন। শিবরানীর কাছে বসে বললেন, গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখলুম—তোমার রাজাবাবু ও বৌরানী বেড়াতে বেরিয়েছেন মোটরে।

—বৌরানী—এখানে কাশীতে? ব্যাকুল আগ্রহে বলল কেমন দেখলে তাঁকে।

—বেশ ভালো—মোটরে রাজাবাবুর পাশে বসে যাচ্ছেন, সঙ্গে খুকি রয়েছে।

—বৌরানীকে আমি দেখতে চাই কেমন করে দেখা পাব।

—বৌরানীকে দেখতে গেলে আগে রাজাবাবু দেখা দেবেন—সেটা জানো তো? ব'লে সুবরেণ্য একটু মুচকে হাসলেন।

হাসির দিকে দৃকপাত না করে শিবরানী বলল,—বৌরানীর পুণ্যফলে অভিশাপ আশীর্বাদ হয়ে গেছে আমার জীবনে।

—আর একটু হোলে তুমি তার সতীন হয়ে পড়েছিলে যে।

শিবরানীর বুক ফেটে কান্না ও চোখ ফেটে জল এল এ কথায়।

—অমন সর্বনাশের কথা মুখে এনো না। সাধ্বী বৌরানীর স্বামী কেড়ে নেয় এমন সাধ্য কার।

তোমার স্বামী যদি কেউ কেড়ে নেয় রানী?

—বুকটা আমার পুড়ে ছাই হবে—খাঁ খাঁ করবে শূন্য শ্মশানখানা হাহাকারে ভরে। বুকটা যেন তার মুচড়ে ভাঙতে লাগল।

সুবরেণ্য বুঝলেন এ প্রসঙ্গে শিবরানী ঠাট্টা সইতে পারবে না এতটুকু। তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন,—

—রাজাবাবুদের বাঁচবার মূলে দেওয়ানজির দরদ, আমাদের সৌভাগ্যের মূলে পয়ামাসির পয়—নয় কি রানী। এদের কোথায় ঠাঁই হবে বলো তো !

—ধ্রুবলোকে—যেখানে মুহূর্তের স্খলন নাই।

ভুশণ্ডীর মাঠে

পরশুরাম

শিবু ভট্টাচার্যের নিবাস পেনেটি গ্রামে। একটি স্ত্রী, তিনটি গরু, একতলা পাকা বাড়ি, ছাব্বিশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি, কয়েক ঘর প্রজা—ইহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়। শিবুর বয়স বত্রিশ। ছেলেবেলায় স্কুলে যা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং বাপের কাছে সামান্য যেটুকু সংস্কৃত পড়িয়াছিল তাহা সম্পত্তি এবং যজমানরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শিবুর মনে সুখ ছিল না। তাহার স্ত্রী নৃত্যকালীর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, আঁটো সাঁটো মজবুত গড়ন, দুর্দান্ত স্বভাব। স্বামীর প্রতি তাহার যত্নের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু শিবু সে যত্নের মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইত না। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া স্বামি-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিত। পাঁচমিনিট বকাবকির পরেই শিবুর দম ফুরাইয়া যাইত, কিন্তু নৃত্যকালীর রসনা একবার ছুটিতে আরম্ভ করিলে সহজে নিরস্ত হইত না। প্রতিবারে শিবুরই পরাজয় ঘটিত। স্ত্রীকে বশে রাখিতে না পারায় পাড়ার লোকে শিবুকে কাপুরুষ, ভেড়ো, মেনীমুখো প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। ঘরে বাহিরে এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় শিবুর অশান্তির সীমা ছিল না।

একদিন নৃত্যকালী গুজব শুনিল তাহার স্বামীর চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে। সেদিনকার বচসা চরমে পৌঁছিল—নৃত্যকালীর ঝাঁটা শিবুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। শিবু বেচারা ক্রোধে ক্ষোভে কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কোনও গতিকে রাত কাটাইয়া পরদিন ভোর ছ-টার ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

শেয়ালদহ হইতে সোজা কালীঘাটে গিয়া শিবু নানা উপচারে পাঁচ টাকার পূজা দিয়া মানত করিল—'হে মা কালী, মাগীকে ওলাউঠোয় টেনে নাও মা। আমি জোড়া পাঁঠার নৈবিদ্যি দেব। আর যে বরদাস্ত হয় না। একটা সুরাহা ক'রে দাও মা, যাতে আবার নতুন ক'রে সংসার পাততে পারি। মাগীর ছেলেপুলে হ'ল না, সেটাও তো দেখতে হবে। দোহাই মা!'

মন্দির হইতে ফিরিয়া শিবু বড় এক ঠোঙা তেলেভাজা খাবার, আধ সের দই এবং আধ সের অমৃতি খাইল। তার পর সমস্ত দিন জন্তুর বাগান, জাদুঘর, হগ সাহেবের বাজার, হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা বীডন স্ট্রীটের হোটেল-ডি-অর্থোডক্সে এক প্লেট কারি, দু প্লেট রোস্ট ফাউল এবং আটখানা ডেভিল জলযোগ করিল। তার পর সমস্ত রাত থিয়েটার দেখিয়া ভোরে পেনেটি ফিরিয়া গেল।

মা-কালী কিন্তু উলটা বুঝিয়াছিলেন। বাড়ি আসিয়াই শিবুর ভেদবমি আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল, ফলে কিছুই হইল না। আট ঘণ্টা রোগে ভুগিয়া স্ত্রীকে পায়ে ধরাইয়া কাঁদাইয়া শিবু ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইল। পেনেটির আড়পার কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তরমুখ হইয়া ক্রমে রিশড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানির চটকল ছাড়াইয়া আরও দু-তিন ক্রোশ দূরে ভুশণ্ডীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদূর বিস্তৃত, জনমানবশূন্য। এককালে এখানে ইটখোলা ছিল সেজন্য সমতল নয়, কোথাও গর্ত, কোথাও মাটির ঢিপি। মাঝে মাঝে আসশ্যাওড়া, ঘেঁটু, বুনো ওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ। শিবুর বড়ই পছন্দ হইল। একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ইটের পাঁজার এক পাশে

একটা লম্বা তালগাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে একটা নেড়া বেলগাছ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল।

যাঁহারা স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভূত হয় ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিওরির সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই।—নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁহারা মরিলে অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁহারা আস্তিক, তাঁহাদের আত্মা আছে বটে, কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাঁহারা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমত একটি বড় ওয়েটিংরুমে জমায়েত হন। তথায় কল্পবাসের পর তাঁহাদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতকগুলি ভূত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন। সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভূতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতী প্রেতাত্মা বিনা পাসে ওয়েটিং-রুম ছাড়িতে পারে না। যাঁহারা seance দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন বিলাতী ভূত নামানো কী-রকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আমরা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্মফল, হৃয়া হৃষীকেশ, নির্বাণ মুক্তি সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভূত হয় এবং যত্র-তত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে—আবশ্যক-মত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু-চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেহ-বা দশ-বিশ বৎসর পরে, কেহ-বা দু-তিন শতাব্দী পরে। ভূতদের মাঝে-মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ স্বর্গে খুব ফুর্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে পাপ ক্ষয় হইয়া সূক্ষ্মশরীর বেশ হালকা

ঝরঝরে হয়, তা ছাড়া সেখানে অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হইবার সুবিধা আছে। কিন্তু যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে কাশীলাভ হয়, অথবা নেপালে পশুপতিনাথ বা রথের উপর বামনদর্শন ঘটে, কিংবা যাঁহারা স্বকৃত পাপের বোঝা হৃষীকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—একেবারেই মুক্তি।

দু তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শিবু সেই বেলগাছেই থাকে। প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন স্থানে নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ হউক, নৃত্যর একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা হাড়ে-হাড়ে অনুভব করিতেছে। একবার ভাবিল—দূর হ'ক, না-হয় পেনেটিতেই আড্ডা গাড়ি। তার পর মনে হইল—লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাঃ, এইখানেই একটা পছন্দমত উপদেবীর যোগাড় দেখিতে হইল।

ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলার আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কঙ্কালের মত ঝিকমিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্মশরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কাল গুবরে পোকা ভর্‌র্ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে একজোড়া দাঁড়কাক বসিয়া আছে। কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মুদিয়া গদ্‌গদ স্বরে মাঝে মাঝে ক-অ-অ করিতেছে।

একটা কট্‌কটে ব্যাং সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটিগুটি পা ফেলিয়া বেলগাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল, এবং শিবুর দিকে ড্যাব-ডেবে চোখ মেলিয়া টিটকারি দিয়া উঠিল। একদল ঝিঁঝিপোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এতক্ষণে সংগত ঠিক হওয়ায় সমস্বরে রিরিরিরি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্তমাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁখাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইযা ধড়াক ধড়াক করিতে লাগিল। মনে পড়িল—ভুশণ্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পিটু্‌লি-বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটি পেত্নী বাস করে। শিবু তাহাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদমস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিব কাটিয়াছিল। পেত্নীর বয়স হইয়াছে, কারণ তাহার গাল একটু তোবড়াইয়াছে, এবং সামনের দুটা দাঁত নাই। তাহার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে, কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।

একটি শাঁকচুন্নী কয়েকবার শিবুর নজরে পড়িয়াছিল। সে একটা গামছা পরিয়া আর একটা গামছা মাথায় দিয়া এলোচুলে বকের মতো লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর-গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। তাহার বয়স তেমন বেশী বোধ হয় না। শিবু একবার রসিকতার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শাঁকচুন্নী ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফ্যাঁচ করিয়া ওঠে, অগত্যা শিবুকে ভয়ে চম্পট দিতে হয়।

শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভুশণ্ডীর মাঠের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরা-বামনীর পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখানি আছে তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আশ্রয় লইয়াছে। শিবু তাহাকে শুধু একবার দেখিয়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে।

ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়ে রোয়াক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান! শিবুকে দেখিয়া নিমেষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রং! নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মতো কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস।

শিবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল—

আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
কারে রেখে কারে ফেলি।

সহসা প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া নিকটবর্তী তালগাছের মাথা হইতে তীব্রকণ্ঠে শব্দ উঠিল—

চা রা রা রা রা রা
আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্‌লুকে বিটিয়া
কেক্‌রাসে সাদিয়া হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও—

শিবু চমকাইয়া উঠিয়া ডাকিল -- 'তালগাছে কে রে?'

উত্তর আসিল—'কারিয়া পিরেত বা।'

শিবু। কেলে ভূত; নেমে এস বাবা।

মাথায় পাগড়ি, কাল লিকলিকে চেহারা, কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্মা সড়াক করিয়া তালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—'গোড় লাগি বরমদেওজী।'

শিবু। জিতা রহো বেটা। একটু তামাক খাওয়াতে পারিস?

কারিয়া পিরেত। ছিলম বা?

শিবু। তামাকই নেই তা ছিলিম। যোগাড় কর্ না।

প্রেত উবে উঠিল এবং অল্পক্ষণমধ্যে বৈদ্যবাটীর বাজার হইতে তামাক টিকা কলিকা আনিয়া আগ গুল্‌গাইয়া শিবুর হাতে দিল। শিবু একটা কচুর ডাঁটার উপর কলিকা বসাইয়া টান দিতে দিতে

বলিল—'তার পর, এলি কবে? তোর হাল চাল সব বল্।'

কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সারমর্ম এই।—তাহার বাড়ি ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তাহার জরু গরু জমি জেরাত সবই ছিল। তাহার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদমেজাজী, বনিবনাও কখনও হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নীকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয়, এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি কশাইয়া স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে যে মুংরী বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী আর দেশে ফিরিল না, বিবাহও করিল না। নানা স্থানে চাকরি করিয়া অবশেষে চাঁপদানির মিলে কুলীর কাজে ভর্তি হয় এবং কয়েক বৎসর মধ্যে সর্দারের পদ পায়। কিছুদিন পূর্বে একটি লোহার কড়ি হাফিজ অর্থাৎ কপিলকে উত্তোলন করিবার সময় তার মাথায় চোট লাগে। তাহার পর একমাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রেতরূপে এই তালগাছে বিরাজ করিতেছে।

শিবু একটা লম্বা টান মারিয়া কলিকাটি কারিয়া পিরেতকে দিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় মাটির ভিতর হইতে ভাঙা কাঁসরের মতো আওয়াজ আসিল—'ভায়া, কলকেটায় কিছু আছে না কি?'

বেলগাছের কাছে যে ইটের পাঁজা ছিল তাহা হইতে খানকতক ইট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব দেহ, থেলো হুঁকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে-রকম হয় সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই, পরনে গরদের ধুতি, পায়ে তালতলার চটি। আগন্তুক শিবুর হাত হইতে কলিকাটি লইয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণ? দণ্ডবৎ হই। কিছু সম্পত্তি ছিল, এইখানে পোঁতা আছে। তাই যক্ষি হয়ে আগলাচ্ছি।

বেশী কিছু নয়—এই দু-পাঁচশো। সব বন্ধকী তমসুক দাদা—ইষ্টাম্বর কাগজে লেখা—নগদ সিক্কা একটিও পাবে না। খবরদার, ওদিকে নজর দিও না—হাতে হাতকড়ি পড়বে, থুঃ থুঃ।'

শিবুর মেঘদূত একটু আধটু জানা ছিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—'যক্ষ মহাশয়, আপনিই কি কালিদাসের—'

যক্ষ। ভায়রাভাই। কালিদাস আমার মাসতুতো শালীকে বে করে। ছোকরা হিজলিতে নিমকির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। তুমি তার নাম জানলে কিসে হ্যা?

শিবু। আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েছে?

যক্ষ। আমার আগমন? হ্যা হ্যা! আমি বলে গিয়ে সাড়ে তিন কুড়ি বচ্ছর এখানে আছি। কত এল দেখলুম, কত গেল তাও দেখলুম। আরে তুমি তো সেদিন এলে, কাটপিঁপড়ে তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট খেয়ে গাছে উঠলে। সব দেখেছি আমি। তোমার গানের শখ আছে দেখছি—বেশ বেশ। কালোয়াতি শিখতে যদি চাও তো আমার শাগরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ একটু খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা।

শিবু। মশায়ের ভূতপূর্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

যক্ষ। বিলক্ষণ। আমার নাম নদেরচাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে। সাবেক পেশা দারোগাগিরি, ইলাকা রিশড়ে ইস্তক ভদ্রেশ্বর। জর্জটি সাহেবের নাম শুনেছ? হুগলির কালেক্টর—ভারি ভালবাসত আমাকে। মুল্লুকের শাসনটা তামাম আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। নাদু মল্লিকের দাপটে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

শিবু। মশায়ের পরিবারাদি কি?

যক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'সব সুখ কি কপালে হয় রে দাদা! ঘর-সংসার সবই তো ছিল, কিন্তু গিন্নীটি ছিলেন খাণ্ডার।

বলব কি মশায়, আমি হলুম গিয়ে নাছু মল্লিক—কোম্পানির দেওয়ানী ফৌজদারী নিজামত আদালত যার মুঠোর মধ্যে—আমারই পিঠে দিলে কিনা এক ঘা চেলা-কাঠ বসিয়ে! তার পরেই পালাল বাপের বাড়ি। তিন-শ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না। কিন্তু যাবে কোথা? গুরু আছেন, ধর্ম আছেন সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগী ফৌত হ'ল। সংসারধর্মে আর মন বসল না। জর্জটি সাহেব বিলেত গেলে আমিও পেনশন নিয়ে এক শখের যাত্রা খুললুম। তার পর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আড্ডা গেড়েছি। ছেলেপুলে হয় নি তাতে দুঃখু নেই দাদা। আমি করব রোজগার, আর কোন্ আবাগের-বেটা-ভূত মানুষ হয়ে আমার ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিস হবে—সেটা আমার সইত না। এখন তোফা আছি, নিজের বিষয় নিজে আগলাই, গঙ্গার হাওয়া খাই আর বব-বম্ করি। থাক, আমার কথা তো সব শুনলে, এখন তোমার কেচ্ছা বল।'

শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করিল, কারিয়া পিরেতের পরিচয়ও দিল। যক্ষ বলিলেন—'সব স্যাঙাতের একই হাল দেখছি। পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ করে ফল নেই, এখন একটু গাওনা-বাজনা করি এস। পাখোয়াজ নেই—তেমন জুত হবে না। আচ্ছা, পেট চাপড়েই ঠেকা দিই। উহুঁ—ঢনঢন করছে। বাবা ছাতুখোর, একটু এঁটেল-মাটি চটকে এই মধ্যিখানে থাবড়ে দে তো। ঠিক হয়েছে। চৌতাল বোঝ? ছ মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক। বোল শোন—

ধা ধা ধিন্ তা কৎ তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তা কে।
ধরে তাড়া ক'রে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্তা গিন্নী কর্তা গাধারে।
ঘাড়ে ধ'রে ঘন ঘন ঘা কত ধুম্ ধুম্ দিতে থাকে

টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্‌টে পাল্‌টে ফ্যালে
গিন্নী ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয় ;
ধাক্‌কা ধুক্‌কি দিতে ত্রুটি ধনী করে না
নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা—

'ধা'-এর উপর সোম। ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা। এই 'ধা' ফসকালেই সব মাটি। গলাটা ধরে আসছে। খোট্টাভূত, আর এক ছিলিম সাজ বেটা।'

উদ্‌যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য। অনেক কাকুতি-মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু সে এখনও কথা বলে নাই, ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইশারায় সম্মতি জানাইয়াছে। আজ ভৌতিক পদ্ধতিতে শিবুর বিবাহ। সূর্যাস্ত হইবা-মাত্র শিবু সর্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করিল, গাবের আটা দিয়া পইতা মাজিল, ফণি-মনসার বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়াইল, টিকিতে একটি পাকা তেলাকুচা বাঁধিল। ঝোপে ঝোপে বনজঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একরাশ ঘেঁটুফুল, বঁইচি, কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করিল। তার পর সন্ধ্যায় শেয়ালের ঐকতান আরম্ভ হইতেই সে ক্ষীরী-বামনীর ভিটায় যাত্রা করিল।

সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। ঘরের দাওয়ায় কচুপাতার আসনে ডাকিনীর সম্মুখে বসিয়া শিবু মন্ত্রপাঠের উদ্‌যোগ করিয়া উৎসুক চিত্তে বলিল—'এইবার ঘোমটাটা খুলতে হবে।'

ডাকিনী ঘোমটাটা সরাইল। শিবু চমকিত হইয়া সভয়ে বলিল—'অ্যাঁ! তুমি নেত্য?'

নৃত্যকালী বলিল—হ্যাঁরে মিন্‌সে। মনে করেছিলে ম'রে আমার কবল থেকে বাঁচবে! পেত্নী শাঁকচুন্নীর পিছু পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?'

শিবু। এলে কি করে? ওলাউঠোয় নাকি?

নৃত্যকালী। ওলাউঠো শত্তুরের হ'ক। কেন, ঘরে কি কেরাসিন ছিল না?

শিবু। তাই চেহারাটা ফরসাপানা দেখাচ্ছে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। ধাতটাও একটু নরম হয়েছে নাকি?

শুভকর্মে বাধা পড়িল। বাহিরে ও কিসের গোলযোগ? যেন এক-পাল শকুনি-গৃধিনী ঝুটোপটি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে। সহসা উল্‌কার মতো ছুটিয়া আসিয়া পেত্নী ও শাঁকচুন্নী উঠানের বেড়ার আগড় ঠেলিয়া ভীষণ চেঁচামেচি আরম্ভ করিল (ছাপাখানার দেবতাগণের সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলাম, পাঠকগণ ইচ্ছা-মত বসাইয়া লইবেন)।

পেত্নী। আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব লা?

শাঁকচুন্নী। আ মর বুড়ী, ও যে তোর নাতির বয়সী।

পেত্নী। আহা, কি আমার কনে বউ গা!

শাঁকচুন্নী। দূর মেছোপেত্নী, আমি যে ওর দু-জন্ম আগেকার বউ।

পেত্নী। দূর গোবরচুন্নী, আমি যে ওর তিন জন্ম আগেকার বউ।

শাঁকচুন্নী। মর্ চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনী মাগী মিনসেকে নিয়ে উধাও হ'ক।

তখন পেত্নী বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল—'আগে তোর ঘাড় মটকাব তার পর ডাইনী বেটীকে খাব।' কামড়াকামড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল। একা নৃত্যকালীতেই রক্ষা নাই তাহার উপর পূর্বতন দুই জন্মের আরও দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পইতা জড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে লাগিল। নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগিল।

এমন সময় নেপথ্যে যক্ষের গলা শোনা গেল—

ধনী, শুনছ কিবা আনমনে,

ভাবছ বুঝি শ্যামের বাঁশি ডাকছে তোমায় বাঁশবনে।
ওটা যে খ্যাঁকশেয়ালী, দিও না কুলে কালি
রাত-বিরেতে শ্যালকুকুরের ছুঁচোপ্যাঁচার ডাক শুনে।

যক্ষ বেড়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—'ভায়া, এখানে হচ্ছে কি? এত গোল কিসের?'

কারিয়া পিরেত হাঁকিল—'এ বরম পিচাস, আরে দরবাজা তো খোল।' শিবুর সাড়া নাই।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল, কিন্তু মন্ত্রবদ্ধ আগড় খুলিল না; বেড়াও ভাঙ্গিল না। তখন কারিয়া পিরেত তারস্বরে উৎপাটনমন্ত্র পড়িল—

মারে জ্ জুয়ান—হেঁইয়া
আউর ভি থোড়া—হেঁইয়া,
পর্বত তোড়ি—হেঁইয়া
চলে ইঞ্জন—হেঁইয়া
ফটে বয়লট—হেঁইয়া
—খবরদার—হা-ফিজ।

মড় মড় করিয়া ঘরের চাল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—'একি, গিন্নী এখানে? বেহ্মদত্যিটার সঙ্গে! ছি ছি—লজ্জার মাথা খেয়েছ?'

ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল—'আরে মুংরী, তোহর শরম নহি বা?'

তার পর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী—এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভুশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য,

পিশাচ, তাল, বেতাল প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। স্পূক, পিক্সি মেম, গব্‌লিন প্রভৃতি গোঁফ-কামানো বিলাতি ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ প্রভৃতি লম্বা-দাড়িওয়ালা কাবুলী ভূত দাপাদাপি আরম্ভ করিল। চিং চ্যাং, ফ্যাচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চীনে-ভূত ডিগবাজি খাইতে লাগিল।

রামরাম রাম। জয় হাড়িঝি চণ্ডী, আজ্ঞা কর মা! কে এই উৎকট দাম্পত্যসমস্যার সমাধান করিবে? আমার কম্ম নয়। ভূতজাতি অতি নাছোড়বান্দা, ন্যায্যগণ্ডা ছাড়িবে না। পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব, ভূতের ভূতত্ব, পেত্নীর পেত্নীত্ব—এ-সব তাহারা বিলক্ষণ বোঝে। অতএব সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাঁড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিন—যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনও রকম নীতিবিগর্হিত বিদ্‌-কুটে ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন, তবে চাঁদা তুলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাহাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।

সহযাত্রী

রাখালচন্দ্র সেন

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে কিন্তু গোধূলির আলো তখনো স্পষ্ট। ফ্রান্সের যে অংশের মধ্য দিয়া গাড়ি ছুটিতেছিল, এমন সুন্দর দেশ আমি খুব কম দেখিয়াছি। সমতল নয়, অথচ পাহাড়ে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়া যায় না। দুধারে একরকম লম্বা ঘাসে ভরা মাঠ, আর কেবল বন। শরৎশেষে ঝরিবার আগে পাতায় পাতায় এক অপূর্ব্ব রং ধরিয়াছে। বিন্দুমাত্র বাতাস নাই। সমস্ত প্রকৃতি যেন ছবির মতো নিস্পন্দ ও স্বপ্নের মতো অলীক—জোরে বাতাস দিলে যেন মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া যাইবে।

দেখিয়া দেখিয়া চোখ ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। ক্ষয়ের প্রারম্ভের রূপের মাঝে কী মোহ আছে জানি না। থাকিয়া থাকিয়া আমার মনে পড়িতেছিল আমাদের দেশের ফুলঝুরি নদীর কথা। জোয়ার আসিয়া নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিলে কিছুক্ষণ আর স্রোত থাকিত না, ঢেউ উঠিত না। আপন পরিণতিতে সে প্রবাহিণী এক অপরূপ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিত। তার পর ভাঁটার টান ধরিত।

অথচ মনের একাংশে ভালোও লাগিতেছিল না। সমস্ত দিন গাড়িতে একাকী। বুলয়েন-এ উঠিয়াছিলাম সকাল প্রায় নয়টার সময়—আর তার পরদিন প্রায় দশটার সময় জেনোয়াতে নামিবার কথা। আমাদের কয়েকখানি গাড়ি প্যারিসে এই ট্রেনের সহিত জুড়িয়া দিয়াছে। যাত্রী বেশি ছিল না। সবগুলিই ঘুমাইবার গাড়ি। "রেস্তোরাঁ-কার" অবশ্য ছিল, এবং সেখানে মাধ্যাহ্নিক আহারের

সময় সহযাত্রীদের দেখিয়াছি। মাত্র আট-দশ জন। তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের কথা আমার আজও মনে আছে।

এক ছিলেন এক তরুণ দম্পতি। বোধহয় "হানি মুন"-এর যাত্রী। ক্ষণে ক্ষণে তরুণীটি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছিলেন এবং চোখে চোখে পড়িতেই ঈষৎ হাসিতেছিলেন। স্বামীটি টমাস্ কুক্-এর প্রণীত ভ্রমণ-পঞ্জী মন দিয়া পড়িতেছিলেন এবং বোধহয় দায়িত্ববোধের নূতন উপলব্ধিতে তাহারি এক কোণে তাঁহাদের ব্যয়ের হিসাব লিখিতেছিলেন। তরুণী তনুদেহা, সুকেশী ও সুন্দরী। মুখের গড়নে ও কেশবিন্যাস-ভঙ্গীতে রম্‌নী-র আঁকা লেডি হ্যামিল্‌টন্-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিছু দূরে একটি টেবিলে বসিয়াছিলেন একটি বৃদ্ধা, আর নার্সের পোষাকে তাঁহার সঙ্গিনী। বৃদ্ধা খাইতেছিলেন ও নার্সটি বৃদ্ধার পুরাতন ডায়েরী পড়িয়া শুনাইতেছিল। বৃদ্ধার যে সব অংশ শুনিবার ইচ্ছা তাহা সব এক খাতায় ছিল না। নার্সটিকে বারে বারে উঠিয়া যাইতে হইতেছিল, অথচ তাহার মুখে হর্ষ-বিষাদ বা তৃপ্তি-বিরক্তি কিছুরই লক্ষণ দেখিতে পাই নাই। যেন কলের পুতুল কলে চলিতেছে।

ইঁহাদেরই পরের টেবিলে বসিয়াছিলেন আর একটি মহিলা। তাঁহাকে দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা কিছু শক্ত। বোধহয় ত্রিশের উপর হইবে। দেখিলে মনে হয় বোদ্‌লেয়র্-এর মানস-লোকের কোনো মূর্তি সজীব হইয়া দেখা দিয়াছে। যেমনি দীর্ঘ তেমনি প্রশস্ত, দৃঢ় দেহ আর আয়ত চোখ। ইয়ারিঙদুটি অদ্ভুত রকমের, কাঁধে লুটাইয়া পড়িয়াছে। আদিম-জাতির মতো কর্ণ-সজ্জার জন্যই হোক্ আর অন্য কোনো কারণেই হোক, মুখের মধ্যে যেন একটা নিষ্ঠুর শক্তির ব্যঞ্জনা ছিল। ইঁহার পাশে তরুণীটির কোমল লাবণ্য যেন স্বাদহীন ও অর্থশূন্য।

তাহার পর কয়েকটি টেবিল খালি ছিল। সর্ব্বশেষের টেবিলে একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। আমাদের দেশ হইলে তাঁহাকে

প্রৌঢ় বলিতাম। তাঁহার চেহারায় শুধু তাঁহার চোখ দুটি ছাড়া আর কোনো বৈলক্ষণ্য ছিল না। চোখ দুটি যেন পৃথিবীতে অফুরন্ত কৌতুক খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং অপরকে তাহা জানাইবার জন্য ব্যগ্র। ভদ্রলোককে দেখিলেই মনে হয় তাঁহার ক্ষুধা ভালো হয়, আহার ভালো জোটে এবং নিদ্রার জন্য বেগ পাইতে হয় না।

সান্ধ্যভোজে আমার যাইতে কিছু দেরি হইয়াছিল। কিন্তু শেষোক্ত ভদ্রলোকটি আমারও পরে আসিলেন এবং আমাকে অভিবাদন করিয়া টেবিলেই বসিলেন। তখন আর সকলে শেষ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে।

ভদ্রলোককে শেষ অবধি আমি ভালো বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে যে জিনিস ব্যাখ্যা করিয়া বোঝানো যায় না, এবং যাহার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ আছে কিনা সন্দেহ, ভদ্রলোকের তাহা ছিল—charm। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমার সহিত অনেকখানি আলাপ করিয়া লইলেন। অথচ তাঁহার মধ্যে ইতর কৌতূহল বা অযথা ঘনিষ্ঠতা কিছুই ছিল না। আমার বয়স তাঁহার অপেক্ষা অনেক কম ছিল। অনেক কথা তিনি আমাকে উপদেশের সুরে বলিতেছিলেন এবং আমি কোনো প্রতিবাদ করিতে গেলেই তাঁহার চোখে একরূপ হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল—ভাবটা যেন "আমি বেশ জানি যে পৃথিবীর যত বুদ্ধি ও জ্ঞান আমার সহিত ফুরাইয়া যাইবে না। শুনিলেই না হয় আমার কথাগুলি, ইচ্ছা হয় কাল ভুলিয়া যাইয়ো।"

তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গীটা ছিল কিছু বিশেষ রকমের। এক কথার শেষ হইতে না হইতে হিতোপদেশের 'কথমেতৎ'-এর মতো অন্য কথা পাড়িতে ছিলেন। তবে মূল কাহিনী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছিল না। তারপর অনেক সময়ে আমার দিক্ হইতে অনেক আপত্তি কল্পনা করিয়া লইয়া সেগুলি খণ্ডন করিতে-

ছিলেন।

কিছুক্ষণ কথা হইতেই আমি অনুভব করিয়াছিলাম যে আমি ছিলাম উপলক্ষ্য মাত্র। সেই যাত্রায় সেই সব কথা তাঁহার কাহারো কাছে বলা আবশ্যক ছিল। আমি কতটুকু বিশ্বাস করি, বা তাঁহার মত কতটুকু গ্রহণ করি, সেটা তাঁহার নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না।

খাওয়া শেষ হইতে তিনি ওয়েটার-কে দু গ্লাস আব্‌স্যাং আনিতে বলিলেন। আমার জানাইতে হইল যে সুরাপান করা আমার অভ্যাস নাই। তিনি আমাকে ধূমপান করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাও করি না শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন "কোনো রকম বদভ্যাস নাই। এটা ভালো কথা নহে। একটা কিছু আরম্ভ করো! নতুবা জীবনে বন্ধু পাইবে না।"

আমি উত্তর দিলাম "বন্ধুলাভের জন্য যে এ সব করিতে হয়, ইহা তো আমার জানা ছিল না।"

সহযাত্রী আমার জন্য জিঞ্জার বিয়ার আনিতে বলিলেন ও আমাকে কহিলেন—"আমার সহিত সমান বেগে পান করিলে কাল ভোরের আগে তুমি জিঞ্জার বিয়ারের ভিন্‌টেজ ইয়ার (vintage years) সম্বন্ধে পণ্ডিত হইয়া যাইবে। আর বন্ধুত্বের কথা বলিতেছিলাম এইজন্য যে নিখুঁৎ মানুষকে সবাই সন্দেহ করে। সন্দেহটা অহেতুক নয়। মানুষের পক্ষে নিখুঁৎ হওয়া এত অস্বাভাবিক যে বাহির নিখুঁৎ দেখিলে ভিতর সম্বন্ধে একটা সন্দেহ মানুষের স্বতঃই মনে আসে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি 'সিনিক'?"

সহযাত্রী হাসিলেন, বলিলেন "না 'সিনিক' আমি নই। ঠাট্টা করিতে-ছিলাম! কিন্তু সকলের চেয়ে আমি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করি নিজেকে। সময়ে সময়ে মনে হয় আমার মধ্যে দুজন লোক আছে। একজন

দেখে ও আর একজন করে। প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে অসীম কৃপার চক্ষে দেখে ও হাসে। এ হাসি মনের টিঞ্চার আয়োডিন, এ যে পাইয়াছে তাহার সিনিক হওয়া অসম্ভব।"

তারপর বোধহয় অন্য কথা পাড়িবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি স্প্যানিশ জানো?"

আমি কহিলাম "না।"

"তোমার শেখা উচিত, সহজ ভাষা। তারপর কাল্‌দেরন পড়িতে পারিবে। সে ছন্দ, সে ঝঙ্কার, সে গাম্ভীর্য্য পৃথিবীর আর কোনো কবিতে পাইবে না। স্পেনে গিয়াছ নিশ্চয়।"

স্বীকার করিতে হইল যে স্পেনেও আমি যাই নাই।

তিনি কহিলেন "আবার যখন ইউরোপে আসিবে স্পেনে যাইয়ো। কিছুদিন সেভিল্‌-এ থাকিয়ো। সৃষ্টির সেরা সুন্দরী নারী দেখিবে। আল্‌হাম্‌ব্রা, কর্দোভা এ সবই একদিন হয়তো আমরা ভুলিব, কিন্তু এই অলোকসামান্য রমণী-রূপ আমাদের চিরদিন মূরদের নিকট ঋণী রাখিবে।

—কিন্তু তাহাদের সহিত খেলিতে যাইয়ো না। তাহারা তোমাদের প্রাচ্য দেশের নারী নয় যে প্রদীপের সলিতার মতো একটু একটু করিয়া নিজেকে ক্ষয় করিবে, তবু কখনো অগ্নিকাণ্ড করিবে না। বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে বিবাহ করিয়ো।"

প্রাচ্যনারীর প্রতি এ ইঙ্গিত আমার ভালো লাগে নাই। কহিলাম "স্প্যানিশ নারী বিবাহ করিবার মতো উচ্চাশা আমার কিছুমাত্র নাই, আর প্রাচ্যদেশের নারী সম্বন্ধে আপনার এ ধারণা কী করিয়া হইল?"

সহসা তিনি গম্ভীর হইলেন। এমন কি তাঁহার চঞ্চল চোখের হাসিও যেন থামিয়া গেল। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিলেন—"অসন্তুষ্ট হইয়ো না। আমার কথা বলিবার ভঙ্গীই ঐ। যখন যাহা বলি

কিছু অতিরিক্ত জোরের সহিত বলি। সব দেশেই সব রকমের স্ত্রীলোক আছে। এই যে সেভিল-এর সুন্দরীদের কথা বলিতেছি ইহারাও লণ্ডনের কুয়াশাবৃত পথে তোমার চোখে সুন্দরী মনে হইবে না। তাহাদের দেখা চাই তাহাদের স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে—সেই উজ্জ্বল রৌদ্র, সেই কঙ্কর-রাঙা পথ ও সেই ফলভরা কমলা-গাছের সারি। তাহারি মাঝখানে তাহাদের না দেখিলে বুঝিবে না সেই কালো চুলের ও কালো চোখের ছায়ার কী মায়া।

স্পেনে গিয়া একদিন 'বুল্ ফাইট্' দেখিতে যাইয়ো। সেদিন সাধারণত একটি উৎসবের দিন থাকে। দলে দলে ছুটির সাজে মেয়েরা আসিবে, দেখিবে তাহারা প্রত্যেকেই রাজরাণী হইবার যোগ্য!"

ইহার পর কিছুক্ষণ কোনো কথা হয় নাই। অনুভব করিলাম তর্ক উঠাইয়া আমি রসভঙ্গ করিয়া দিয়াছি। সহযাত্রীকে খুসী করিবার জন্য কহিলাম—

"আপনি তো চমৎকার ইংরেজি বলেন।"

ইংরেজি সত্যিই তিনি ভালো বলিতেছেন তবে তাহাতে বিদেশীসুলভ টান ছিল। তিনি উত্তর দিলেন "আমি বহুদিন ইংলণ্ডে আছি। বুঝিতেই পারিয়াছ আমার জন্ম স্পেনে। সেখানে আমার কৈশোর অবধি কাটে। তার পর কিছুদিন ফ্রান্সে ছিলাম। তার পর হইতে বরাবর ইংলণ্ডেই আছি।"

"আপনি স্পেনে ফিরিবেন না?"

"সম্ভাবনা কম, আমার কারবার ইংলণ্ডে।"

"চিরদিন এইরূপ বিদেশে থাকিতে ভালো লাগিবে?"

সহযাত্রীর গ্লাস কিছু আগেই শূন্য হইয়াছিল। আর এক গ্লাস আনাইয়া লইয়া কহিলেন "সবি সহিয়া আসে। ইংলণ্ড আমার মন্দ লাগে না, আর জাতি হিসাবে ইংরেজদের আমি শ্রদ্ধা করি—

সুতরাং কষ্ট বিশেষ কিছু নাই।
শ্রদ্ধা করি এইজন্য যে তাহাদের যাহা আছে আমাদের তাহা নাই। যদি কখনো জানিতে চাও যে একজনের মধ্যে কী নাই, তবে সে যাহাদের পছন্দ করে তাহাদের খোঁজ করিয়ো। আর যদি জানিতে চাও সে সত্যই কী প্রকৃতির, খোঁজ করিয়ো তাহাদের যাহাদের সে খুব বড়াই করিয়া ঘৃণা করে। কী জানো—ঘটনাক্রমে—কোনো জাতি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারে। কিন্তু শক্তিমান ও বুদ্ধিমান না হইলে সাম্রাজ্য কেহ রাখিতে পারে না।"
আমি কহিলাম "সাম্রাজ্য তো আপনাদেরও একদিন ছিল। আপনাদের জাতিও তো একদিন অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বর ছিল—"
"ছিল সত্য, কিন্তু সেদিন হয়তো আমাদের চরিত্রও অন্যরকমের ছিল। কখনো বিশ্বাস করিয়ো না যে জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না। যে দিন প্রতি স্পেনীয় পরিবারের অর্দ্ধেক পুরুষ থাকিত হাজার হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর নানাস্থানে, যখন প্রবাসে তাহাদের চলিতে হইত বিজয়ীর গর্ব্ব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, তখনকার দিনে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই অন্যরকমের ছিল।
কেন যে জাতির উত্থান বা পতন হয়, আমি জানি না—তবে ইংরেজদের আমি শুধু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া শ্রদ্ধা করি না। কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাদের শক্তি অদ্ভুত। সব চেয়ে মূর্খ ইংরেজকে কোনো একটি শক্ত বিপদে ফেলিয়া দেখিয়ো ইহাদের শক্তির মূল কোথায়। তাহাদের চিন্তাশক্তি প্রখর নয়, প্রকাশের ক্ষমতা সাবলীল নয়, কিন্তু বিপদে সংগ্রামে যদি সাথী খুঁজিতে হয়, তবে ইংরেজের চেয়ে ভালো সাথী কেহ নাই।
অপূর্ব্ব সাহস এ জাতির। তোমাকে বোধহয় এখনো বলি নাই গত মহাযুদ্ধে আমি ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়াছিলাম। খুব বেশি দিন আমাকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, না হইলে হয়তো আজ এখানে বসিয়া

তোমার সহিত গল্প করিতাম না। অনেকগুলি ভাষা জানি বলিয়া শীঘ্রই আমার উপর অন্য রকমের কাজের ভার পড়ে। কিন্তু সোম্-এর যুদ্ধে আমি ছিলাম। তখনো বোধ হয় ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ সকলে বোঝেন নাই যে জার্ম্মানদের পরিখাগুলি কিরূপ সুরক্ষিত ছিল, এবং তাহা নষ্ট করিবার জন্য কী শ্রেণীর গোলাগুলির প্রয়োজন। কিছুকাল ধরিয়া আমাদের পক্ষ হইতে যে ভীষণ বম্বার্ডমেণ্ট্ চলিল, তাহার পর ভাবিতে পারি নাই যে শত্রুপক্ষের সম্মুখের দিকের পরিখায় কেহ জীবিত আছে। 'বারাজ্' উঠাইয়া দূরে সরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিল। এক মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইল শত্রুপক্ষের অসংখ্য মেশিনগানের অজস্র গুলিবৃষ্টি। তাহাদের গোলন্দাজেরা আগেই আক্রমণ করিয়াছিল। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিব না। এক এক দল ইংরেজ পড়ে—যেন কোন্ অদৃশ্য কৃষকদল নিপুণ হস্তে তৃণ কাটিতেছে—আবার আর এক দল আক্রমণ করে। চারিদিক হইতে আসে আহতের আর্ত্তনাদ, ইংরেজ-অফিসারদের উচ্চ-কণ্ঠে প্রদত্ত আদেশ ও উৎসাহবাণী, মেশিনগানের শব্দ ও কামানের গর্জ্জন। মনে হইতেছিল এ তো যুদ্ধ নয় যেন কোনো মহাদানবের পূজায় লক্ষবলি।

যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলে কি ?"

বলিলাম "না"। এইখানে এই সম্পর্কে বলিয়া রাখি যে আমার অনেক কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল এবং বলিতে পারি নাই এ কারণে আমার চির-জীবনের একটি আক্ষেপ রহিয়া গিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কিরূপ এককালে হেলায় লঙ্কা জয় করিয়াছিলাম, আমাদের প্রাচীন যৌধেয় জাতির মধ্যে কিরূপ গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, আমাদের দেশে মাৎস্যন্যায়ের সূচনা হইলে প্রজাশক্তি কিরূপে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল, আমাদের সভ্যতার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি—এ সবের কিছু কিছু আমার বন্ধুটিকে জানাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল।

জানাইতে পারি নাই তাহার প্রথম কারণ ভয়। যদি লোকটি আমার চেয়ে এ সব বিষয় ঢের বেশি জানে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি লোকটিকে ঠিক বুঝিতে পারি নাই। দ্বিতীয় কারণ—একটা লজ্জার ভাব। এজন্য নিজের উপর অনেক দিন বিরক্তি আসিয়াছে এবং এ লজ্জার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। তৃতীয় কারণ—এবং এইটিই শ্রেষ্ঠ কারণ—আমার এই দোদুল্যমান মন স্থির করিতে না করিতে বন্ধু আবার আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখ আমার আজিও যায় নাই। তর্কে বা কলহে যে উত্তর দিলে জয় অবশ্যম্ভাবী, সে উত্তর যখন বহুপরে হঠাৎ মনে আসে, অনেকটা সেই মনের অবস্থা লইয়া অনেকদিন আশা করিয়াছি যে একদিন না একদিন আমার সেই সহযাত্রীর সহিত আবার দেখা হইবে।

বন্ধু কহিলেন—"কেমন করিয়াই বা দিবে—যুদ্ধের সময় তো তুমি নিতান্ত বালক ছিলে। তবে তোমার কাছে এ বিষয়ে কোনো অতি-রঞ্জন করিতে চাই না। বর্তমান যুদ্ধপ্রণালী যে রকম, তাহাতে বীরত্বের প্রশ্ন খুব কম ওঠে। সময় মতো যদি নিজের পরিখা ছাড়িয়া না ওঠো, তবে হয় মরিবে শত্রুর গোলায়, না হয় মরিবে নিজের অফিসারের রিবলভারে। তার পর ঠিকমতো যদি অগ্রসর না হও, মরিবে উভয়-পক্ষের গোলায়। যদি কোনো মতে কোথাও লুকাও বা পালাও, হয়তো তারপর দিনই আপন-পরিবারের মাথায় কাপুরুষতার কলঙ্কের বোঝা তুলিয়া দিয়া জীবন-লীলা শেষ করিবে নিকটতম কোনো প্রাচীরের কাছে।

এ কথাও ঠিক যে অন্য জাতির সৈন্যেরাও কম সাহস দেখায় নাই। অস্ত্র নাই, গুলি নাই, খাদ্য নাই—এ অবস্থায় রাশিয়ার সৈন্যগণ যাহা করিয়াছে, যাহা সহিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু তবু আমি বলিব, ইংরেজদের সাহস অপূর্ব্ব, মৃত্যুকে লইয়া তাহারা খেলা করিতে পারিত। মনে পড়ে সোম্-এর যুদ্ধের কিছু আগে

একদিন আমি আমার কোম্পানী পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম। ট্রেঞ্চ্-এর এক অংশে গিয়া দেখি কয়েকজন সৈন্য মহানন্দে তাস খেলিতেছে। আমাকে দেখিয়া লুকাইবার চেষ্টা। কী খেলা জিজ্ঞাসা করিতে প্রথম কেহ কিছু উত্তর দেয় না। অনেক প্রশ্নের পর জানিতে পারিলাম ব্যাপারটা কী। মৃত্যুকে লইয়া তাহারা জুয়া খেলিতেছে। প্রত্যেক তাসের উপর একজনের নাম লেখা আছে। যাহার নাম একজনে টানিয়াছে সেই লোকটি যদি পরের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিহত হয়, তবে যে টানিয়াছে তাহাকে আর যে ক'জন বাঁচিয়া রহিবে তাহারা দুই শিলিং করিয়া দিবে। দুইজনেরই মৃত্যু হইলে ব্যবস্থাটা কী হইবে তাহা আর জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসি—কিন্তু হাসিয়াছিলাম কাঁদা অসম্ভব ছিল বলিয়া।

বালকের দল—ওরা কখনো পরিণতবয়স্ক হয় না। ওদের যাহা কিছু দোষ তাহারও মূল সেইখানে। ছেলেবেলায় যখন স্কুলে যায়, তখন বড়ছেলেদের অত্যাচারে শেখে নিজের উপর নির্ভর করিতে। ধারণা হয় যে হৃদয়াবেগ সহসা প্রকাশ করা পুরুষের পক্ষে হাস্যকর কাজ। আর শেখে ভদ্রলোকে কী করে আর কী করে না। সারা জীবন সে শিক্ষা ভোলে না। যতদিন নিজেদের মধ্যে থাকে, তত-দিন বিশেষ গোলমাল হয় না। কিন্তু পরকে ওরা সহজে বোঝে না। ওদের কাছে একজন লোক হয় ভালো না হয় মন্দ। একটা জাতি হয় শ্রদ্ধার যোগ্য, না হয় শ্রদ্ধার যোগ্য নয়—এমনি করিয়া ওরা জগৎ সাদায় কালোয় ভাগ করিয়া লয়। বিধাতার তুলিতে আর যত রঙ্ আছে সেগুলি ধরিতে ওদের দেরি হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"উহাদের বণিক মনোবৃত্তির কথা শোনা যায় যে—"

বন্ধু কহিলেন—"কোন্ জাতি বণিক নয়? এতকাল তো শুনিয়াছি

তোমাদের মস্‌লিন না হইলে রোমের বিলাসিনীদের মন উঠিত না। বর্ত্তমান জগতের ব্যবস্থাই এই যে যেখানে প্রভুত্ব নাই, সেখানে বাণিজ্য নাই। একমাত্র ইংরেজ তো তোমাদের দেশে বাণিজ্য করিতে যায় নাই—তবে উহারাই রহিয়া গেল।" তারপর একটুখানি নীরব রহিয়া বলিলেন "এসব অপবাদের কোনো মূল্য নাই। ইংরেজ প্রবল জাতি, প্রবলের যাহা প্রাপ্য তাহা ভোগ করিতেছে। মানুষের চরিত্র না পরিবর্ত্তিত হওয়া অবধি এইরূপই চলিবে। কিন্তু ওরা জীবনের কারুকার্য্য বোঝে না। এই দেখো না ওদের প্রিয় খাদ্য বীফ্, আর সেরা পানীয় বিয়ার। গরীব ফরাসীও কোনো না কোনো ওয়াইন্ খায়, তাতে মত্ততা আনে না, পিপাসা নিবারণ করে না, কিন্তু আসে স্বপ্ন।"

এটা আমার নিতান্ত গায়ের জোরের কথা মনে হইয়াছিল। কহিলাম—"যে জাতের মধ্যে এত কবি, এত শিল্পী, তাহার সম্বন্ধে আপনার বর্ণনা ঠিক্ বলিয়া মনে হয় না।"

বন্ধু হাসিলেন—যেন এই কথাটিরই অপেক্ষা তিনি করিতেছিলেন—বলিলেন "একটা জাতির সম্বন্ধে কোনো কথা কি সর্ব্বাংশে খাটে কখনো? খুঁজিতে হয় তার প্রাণ। তবে তুমি ঠিক প্রশ্নই তুলিয়াছ। ইংরেজের মধ্যে একটি ভাবপ্রবণতা ও আদর্শবাদের ধারা আছে, যাহা তাহারা সচরাচর অতি অন্তরালে রাখে কিন্তু দু' একটি জিনিসে তাহা বেশ ধরা পড়ে। প্রতি জাতের মধ্যেই কিছু পরিমাণে গোপন প্রণয় আছে। হয়তো অনেক উপন্যাস পড়িবার সময় তোমার মনে হইয়াছে যে বস্তুটি ফরাসী জাতির বিশেষত্ব। কোনো ফরাসী গ্রামে গিয়া কিছুদিন বাস করিলে বুঝিবে এ কথা কত অসত্য। এমন পরিশ্রমী, সমাজভীরু ও রক্ষণশীল জাতি খুব কম আছে। তাইই বোধ হয় ফরাসী-বিপ্লব এমন সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছিল!

কিন্তু কিছু পরিমাণে আছে তো। তবে সেরূপ অবস্থায় পড়িয়া ফরাসী নারী বা কোনো ল্যাটিন নারী নিজের পরিবার ভাঙে না। তাহার কারণ শুধু ক্যাথলিক ধর্ম্ম নয়। জীবনের এই সব আত্ম-বিস্মৃত মুহূর্ত্তগুলির প্রকৃত মূল্য কী সে তাহা বোঝে। যাহা স্থায়ী—স্বামী, সংসার, সন্তান—এ সব সে ভাসাইয়া দেয় না। কিন্তু প্রণয়ীকে গোপনে সে নিজের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দেয়। আর ইংরেজ এরূপ ক্ষেত্রে অনুভব করে যে বিবাহিত জীবনে ভিন্ন প্রণয় অন্যায়, অস্বাভাবিক,—তাই বিচ্ছেদ-মোকদ্দমা, সন্তান লইয়া কাড়া-কাড়ি—এ সবে তাহার জীবন কলহ-তিক্ত হইয়া উঠে।"

আমি কহিলাম "সত্যভঙ্গের কথা প্রকাশ করাই তো ধর্ম্মবুদ্ধির কাজ ; আর প্রেম যেখানে নাই সেখানে প্রেমের অভিনয় তো এক ভয়াবহ ব্যাপার। ল্যাটিন নারী যখন জানে জিনিসটি স্থায়ী হইবে না, তখন সে যদি প্রণয়ীকে ভালোবাসে মনে করে, তবে কোনো পক্ষকে না কোনো পক্ষকে ভীষণ প্রবঞ্চনা করে।"

বন্ধু কিছুক্ষণ উত্তর দিলেন না এবং একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটু গম্ভীর সুরেই কহিলেন "তোমার মুখে একথা শুনিয়া সুখী হইয়াছি। বয়স যখন তোমার মতো ছিল, তখন আমারো মত ঐ ছিল এবং থাকা উচিতও। আজো যে আমার মনের কোনো অংশ তোমার কথায় সায় দেয় না, তাহা নহে। কিন্তু সংসারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কী জানো—একটা জিনিসকে অনেক ভাবে দেখা যায়, এই সত্যটি গ্রহণ করা। ল্যাটিন নারী যদি প্রবঞ্চনা করে কাহাকেও, সে নিজেকে। বলিবে সেটি সুস্থ মনের চিহ্ন নয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখো, আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া এই জগৎ কি এক মুহূর্ত্ত চলিত ? নিসর্গসুন্দরী আমাদের এ দুর্ব্বলতাটি বেশ জানেন, এবং তাহা আশ্রয় করিয়া আমাদের দিয়া অনেক কাজ করাইয়া নিয়া থাকেন আর আমরা মনে করি আমরা সমাজ-

সংসারের কাছে আমাদের কর্ত্তব্য করিতেছি। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আমরা ভুলিয়া থাকি। সে যে মালঞ্চের মালাকরের মতো কখন্ আসে তাহারো ঠিক্ নাই। শুনিয়াছি এক পথহারা তারার আকর্ষণে আমাদের সৌরজগতের আরম্ভ। আবার যে আর একদিন আর এক পথহারার আকর্ষণে তাহার শেষ হইবে না, কে বলিতে পারে। আর তাহা যদি নাও হয়, তাহা হইলেও তো এই পৃথিবীর জীবনের একদিন অবসান আছে।

মধ্যযুগের মানুষের মনের কথা তাই বোঝা সহজ ছিল। জীবন যখন একটি অনন্ত জীবনের প্রস্তাবনা তখন তাহারই জন্য প্রস্তুত হওয়ায় ছিল তৃপ্তি। সে বিশ্বাস আর নাই। তাই অনেক লেখক সেই অনন্ত জীবনের স্থানে বসাইয়াছেন অনন্ত ভবিষ্যৎ। এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, সপ্ত সমুদ্র লেমনেডে ভরিয়া যাইবে। ধরিয়া লইলাম হইবে—কিন্তু আমার তাহাতে কী আসে যায়? ততদিন আমার কোনো বংশধর থাকিবে কিনা তাহাও জানি না। সেদিনের জন্য আজ আমি কেন উপবাসী থাকি?

কিন্তু তবু তো সেই ভবিষ্যতের জন্য কাজ করিয়াই যাই। মানুষের এ আত্ম-প্রবঞ্চনা মর্ম্মগত বস্তু। এ সে অতিক্রম করিতে পারে না। ল্যাটিন নারীও তাই চোখ খুলিয়াই স্বপ্ন দেখে।

আর ভালোবাসা—হয়তো শব্দটি আমি ব্যবহার করিতেছি এক অর্থে, আর তুমি বুঝিতেছ আর এক অর্থে। হৃদয় যখন অন্যকে চায়, তখনো যাহার সহিত সুখে দুঃখে জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, সে তুচ্ছ নয়। তাহার বুকে মর্ম্মান্তিক আঘাত হানিবার অর্থাৎ তাহাকে সকল কথা বলিবার কারণ ল্যাটিন নারী খুঁজিয়া পায় না।

বলিতে পার তবে সে পথে না যাওয়াই ভালো। আমিও বলি তাহাই ভালো। কিন্তু মনের মতো মানুষ পাওয়া যায় কই! মনকেই বরং শেখানো পড়ানো চলে। আর যে সে পথে গিয়াছে সে যে কেন

গিয়াছে তাহা ঠিক্ তাহার হৃদয় লইয়া তাহার অবস্থায় না পড়িলে কখনো বুঝিবে না।"

তখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। সহযাত্রী একবার বাহিরে তাকাইয়া বলিলেন "ফ্রান্সের এক অতি সুন্দর প্রদেশের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি কিন্তু এখানে বেশি লোক আসে না। রিভিয়েরা-ই আজ-কালকার ফ্যাশান। দিনের গাড়ি হইলে সব দেখিতে পারিতে। এ দেশটি আমি ভালো করিয়া জানি। এই-খানেই আমার এক বন্ধুর জীবনে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বন্ধুর নাম তোমায় বলিব না। আর বলিলেও তুমি মনে রাখিতে পারিবে না,—কারণ নামটি প্রায় দেড়হাত লম্বা। তাহাকে আমি ডন আন্দ্রে বলিয়া বলিব। সে আমার আশৈশব সহচর। এক শহরে আমাদের জন্ম—গত যুদ্ধের আরম্ভ অবধি আমরা স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে একসঙ্গে জীবন কাটাইয়াছি। কিন্তু কিছুদিন আগে অবধি জানিতাম না যে সে যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মানীর গুপ্তচর ছিল। কিসের আশায় এ সাংঘাতিক কাজে যোগ দিয়াছিল জানি না; এ কাজে সাফল্য লাভ করা কঠিন। সর্ব্বদা ধরা পড়িবার ভয়, আর ধরা পড়িলে জগতে সাহায্য করিবার জন্য কেহ হাত বাড়াইবে না।

এখান হইতে খুব বেশি দূরে নয় একটি সহরে আন্দ্রে ১৯১৭ সালে জুন মাসে অবস্থিতি করিতেছিল। সেই সহরের নিকটেই ফরাসীদের একটি গোলা-কামানের কারখানা ছিল। সেখান হইতে গোপনীয় খবর কিছু সংগ্রহ করা ছিল উদ্দেশ্য। সে একজন ফরাসী ভদ্র-লোকের মতো ফরাসী ভাষা বলিতে পারিত এবং সেই সময়ে এক-জন ফরাসী অফিসারের ছদ্মবেশে ঘুরিতেছিল। সব সময়েই কিছু সংখ্যক অফিসার ছুটীতে থাকিত। যে অফিসারের ছদ্মবেশে গুপ্ত-চর ঘুরিত, তাহার রেজিমেণ্ট্-এর বিস্তৃত বিবরণ, যুদ্ধ সম্বন্ধে

নির্ভুল খবর—এসব না জানিলে, একস্থানে বেশিদিন না থাকিলে, এবং এক নামে বেশিদিন না চলিলে ইহাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলেও খুব বেশি ছিল না।

সে সহরটিতে আন্দ্রে সপ্তাহখানেক থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল। তিন-চার দিন অতীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কাজ কিছুই হয় নাই।

সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি—আন্দ্রে সান্ধ্যভ্রমণের পর নিজের হোটেলে ফিরিতেছিল। চাঁদের আলোতে তখন ভুবন ভরিয়া গিয়াছে।

রাস্তায় জনপ্রাণী নাই, গাড়ি-ঘোড়া চলা নিষিদ্ধ। প্রতি জানালায় কালো পর্দ্দা, পথে কোনো বাতি নাই। কারণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে হইলেও এখানে 'এয়ার-রেড্'-এর ভয় ছিল। আন্দ্রে কিন্তু তখন সে কথা ভাবিতেছিল না। সে রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাস ও কৃত্রিম-আলোক-হীন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণীর শোভা তাহার বিপদ-সঙ্কুল জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত যেন মিষ্টতায় ভরিয়া দিতেছিল।

ধীরে ধীরে সহরের যে স্থানে ঘন বসতি, আন্দ্রে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল। এইখানের নিস্তব্ধতা তাহার বড় অদ্ভুত লাগিতেছিল। যেন মৃত পৃথিবীর উপর ভরা চাঁদ উদাসীনের হাসি হাসিতেছে। তাহার নিজের পায়ের শব্দেই তাহার থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতে-ছিল যেন কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

সহসা যেন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। কাছেই যেন কে তোপ ছাড়ি-তেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি বাড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক মুহূর্ত্তে রাত্রির সেই শান্ত আকাশ এয়ারোপ্লেনের ইঞ্জিনের ঘর্ঘরে মুখরিত হইয়া উঠিল।

আন্দ্রে ছুটিতে আরম্ভ করিল। রাস্তা পার হইতেই গিয়া দেখে যে একটি স্ত্রীলোক অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থায় রাস্তার উপর পড়িয়া আছে। আন্দ্রে তাহাকে তুলিয়া লইয়া ছুটিতে লাগিল। রাস্তার উপরে

কিছু দূরে একটি গির্জ্জা ছিল। দরজা ঠেলা দিতেই খুলিয়া গেল। গির্জ্জায় কেহ ছিল না। শুধু এক অন্ধকার কোণে একটি ভার্জিন মূর্ত্তির পায়ের কাছে একটি মাত্র বাতি জ্বলিতেছিল।

নিজের কোলে রমণীটির মাথা রাখিয়া আন্দ্রে তাহাকে একটি বেঞ্চিতে শোয়াইয়া দিল। তখন বাহিরে কী হইতেছে, তাহা ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। থাকিয়া থাকিয়া যে শব্দ তাহার কানে আসিতেছিল সে যেন কোনো বিজন সৈকতে তরঙ্গ ভাঙ্গিবার শব্দ।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চারিদিক আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তার-পর কয়েক মিনিটের জন্য সাইকেলের ঘণ্টা ও এম্বুলেন্স্ গাড়ির শব্দে সহর যেন জাগিয়া উঠিল। কিছুকাল পরে তাহাও থামিয়া গেল।

এবার আন্দ্রে রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে কি?"

ক্ষীণ কণ্ঠে রমণী উত্তর করিল, "হাঁ, আমাকে বাহিরে লইয়া চলুন।"

বাহিরে আনামাত্র রমণীটি আন্দ্রের হাত ছাড়িয়া সিঁড়িতে বসিয়া পড়িল। তারপর দুর্ব্বল অথচ স্পষ্ট স্বরে কহিল "আপনি আমার অশেষ উপকার করিয়াছেন, কিন্তু এবার আমি ফিরিতে পারিব। আপনি আমার জন্য আর দেরি করিবেন না।"

আন্দ্রে আপত্তি করিয়া বলিল "সে কি হয়? এ অবস্থায় কি আমি আপনাকে একাকী যাইতে দিতে পারি? চলুন আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।"

রমণী উত্তর দিল "না, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—এবার আমি যাইতে পারিব। কিছু মনে করিবেন না। যিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, সাহায্য লইবার প্রয়োজন থাকিলে অবশ্য তাঁহার সাহায্য লইতাম।" তারপর আন্দ্রেকে একটি ঠিকানা দিয়া বলিল—

"এই ঠিকানায় যদি কাল সকালে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন, বিশেষ সুখী হইব।"

এ বিষয়ে আর বাদানুবাদ করা নিষ্ফল মনে করিয়া আন্দ্রে নিজের পথ ধরিল। মাঝে মাঝে ফিরিয়া দেখিল রমণীটি তখনো সিঁড়ির উপর বসিয়া আছে। একবার মনে করিল ফিরিয়া যায়। তারপর ভাবিল রমণীটি হয়তো আরো একটু বিশ্রাম করিতে চায়—আর তারপর তাহার নিজেরই তো সহর।

সে দিন ঘুমাইবার আগে আন্দ্রে 'এয়ার রেড্' অপেক্ষা এই অপরিচিতার কথা বেশি ভাবিয়াছিল। সাজসজ্জায়, কথাবার্তায় তাহাকে ভদ্রকন্যাই মনে হইয়াছিল। যুবতী কিন্তু সুন্দরী নয়। তবু সে রূপের মধ্যে যেন কী একটা আকর্ষণ ছিল। তাহার এই ভবঘুরে জীবনে বহু নারীর সহিত বিভিন্ন রকমের পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন ভাবে আর কেহ তাহার মন আলোড়িত করে নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া আন্দ্রে একবার হাসিয়া উঠিয়া মনে মনে কহিল—"আর কিছু নয়, আমার স্বভাবই হইতেছে রহস্য ভালোবাসা। এই অপরিচিতা যদি আমাকে তাহার সঙ্গে ফিরিতে দিত, তারপর তাহার পিতার সহিত তাহার জীবন-রক্ষক বলিয়া আমার পরিচয় করাইয়া দিত আমি উৎফুল্ল হইয়া ঘরে ফিরিতাম বটে, কিন্তু তাহার কথা আর দ্বিতীয়বার ভাবিতাম না। যাহা করা স্বাভাবিক, তাহা করে নাই বলিয়াই আমি তাহার কথা এত ভাবিতেছি।" ইহার পর তাহার ঘুমাইতে আর বিলম্ব হয় নাই। এবং সে রাত্রিতে যদি কিছু স্বপ্ন সে দেখিয়া থাকে, তবে পরদিন প্রভাতে তাহা তাহার মনে ছিল না।

সে প্রভাতে সে অপরিচিতা যেন তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। একটি বোর্ডিং হাউসে দুইটি ঘর লইয়া সে ছিল। সে সহরের মেয়ে সে নয়। বসিবার ঘরে যাহা থাকা উচিত তাহাই ছিল। দেয়ালে ছিল একখানা মাত্র ছবি। কোনো ফরাসী গ্রামের। গ্রামের পাশ

দিয়া একটি খাল চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার দুই কূলে দীর্ঘ পপ্-লারের শ্রেণী।

এবার দিনের আলোতে আন্দ্রে রমণীকে দেখিল। মুখখানা অনেকটা চৌকোণ, নাকটি ঈষৎ স্থূল, ঘন জোড়া ভ্রূর নীচে ছোট দুইটি চোখ, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ এবং একরাশ সোনালী চুল। যুবতীকে খর্ব্বাকৃতিই বলিতে হইবে, কিন্তু নিটোল সুঠাম গঠন। কী দেহে, কী-সজ্জায়, কী কথাবার্ত্তায় কোথাও তাহার কিছু শিথিলতা ছিল না। নাম মাদেলিন উরেল। বিশেষ কাজে এই সহরে প্রায় একমাস আছে।

এ ক্ষেত্রে আলাপ যেরূপ হইতে হয়, তাহাই হইল। তবে আন্দ্রে যখন বলিতেছিল যে সে বিশেষ কিছুই করে নাই, মাদেলিন যখন আহত হয় নাই তখন একটু পরে বিনা সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতে পারিত তখন বাধা দিয়া মাদেলিন কহিল "সে কথা ঠিক নয়। আমি সে স্থানে আবার গিয়াছিলাম। যেখানে আমি পড়িয়া যাই, তাহার প্রায় দশ হাত দূরে পরে একটি বোমা পড়িয়া গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। আপনি আমাকে না সরাইয়া লইলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল।"

এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যে আন্দ্রে অনুভব করিতেছিল যে আগের রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে অনুভূত সেই আকর্ষণ আজ কী তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সব চেয়ে চোখে পড়ে রমণীর সুন্দর হাত দুটি। গ্রাম-ছাড়া পথের মতো যেন কোন অচিনপুরীর ইঙ্গিতে ভরা।

উঠিবার আগে আন্দ্রে মাদেলিনকে তাহার হোটেলে সেই দিন সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করিল। রমণী ধন্যবাদ সহকারে সম্মতি জানাইল।

জীবনের কোনো অবস্থাতেই আন্দ্রে নিজের কাজ ভোলে নাই। তাহার এই অভিনব চাঞ্চল্য ভরা মন লইয়াও সে সারাদিন নিজের কাজ করিল। সন্ধ্যায় ফিরিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নামিতে

তাহার একটু দেরি হইল। কিন্তু মাদেলিন তখনো আসে নাই। যুদ্ধের সময়ে কোনো হোটেলেই বিশেষ খাওয়া জুটিত না। খাইতে পাইত শুধু সৈন্যেরাই। তবু যাহা সব চেয়ে বেশি দাম দিয়া পাওয়া যায়, আন্দ্রে তাহারই আয়োজন করিয়াছিল। সান্ধ্য ভোজনের কিছু পর যখন মাদেলিনের ফিরিবার সময় হইল, তখন আন্দ্রে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মাদেলিন কোনো আপত্তি করিল না।

এই পরিচয়ের এই সমাপ্তি আন্দ্রে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। অথচ এই ভদ্রকন্যার সমস্ত ব্যবহারই সুরুচিসঙ্গত ও সুশোভন, কোনো প্রগল্‌ভতার অবসর সে আন্দ্রেকে দেয় নাই। এ পরিচয় রাখিবার বা ইহাকে অন্তরঙ্গতায় পরিণত করিবার কোনো উপায় আন্দ্রে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। মাদেলিনের সহিত কথা বলিতে বলিতে ও এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে বোর্ডিং হাউসে উপনীত হইল।

মাদেলিনের নিকট চাবি ছিল। দরজা খুলিয়া আন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইতে আন্দ্রে সাহস করিয়া বলিয়া উঠিল "আমি উপরে আসিতে পারি কি ?"

মাদেলিন দ্বিধা করিল না, স্নিগ্ধ-স্বরে কহিল "এস।"

প্রেমাস্পদের মুখে প্রথম 'তুমি'-সম্বোধন যে কী মধুর, একদিন তুমি তাহা বুঝিবে। ছেলে বেলায় অনেকে চাঁদের দিকে চাহিয়া মনে করে কতগুলি মই জোড়া দিলে চাঁদে পৌঁছানো যায়। আর আজ যেন সেই আকাশের চাঁদ নামিয়া আসিয়া আন্দ্রের কাছে ধরা দিল।

মাদেলিন ভালোবাসিতে জানিত। যে ভাবে প্রেম-মুগ্ধা পত্নী স্বামীর কাছে ধরা দেয়, সেই ভাবে, স্নেহে, মোহে, এবং করুণায় মাদেলিন আন্দ্রের কাছে ধরা দিল। তাহার মধ্যে কোনো স্থূলতা, কোনো

কদর্য্যতা ছিল না।

খানিক পরে যখন তাহারা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন প্রায় মধ্য রাত্রি। এবার আন্দ্রের বিদায় লইবার পালা। মাদেলিনের হাত দুটি নিজের হাতে লইয়া বলিল "এখন আমার যাইবার সময়। তোমাকে কোনোদিন ভুলিব না। আমাকে তুমি মনে রাখিবে এ আশা আমি করি না। তবে যদি কোনোদিন স্মরণ-পথে আসি তখন মনে যাহাতে ঘৃণা না আসে, সেই চেষ্টা করিয়ো।"

মাদেলিন যেন অন্যমনস্ক ছিল। আন্দ্রের কথা শেষ হইতে তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল "তোমারই তো ভুলিবার কথা। আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় তো তোমার জীবনের একটি ছোট অধ্যায় মাত্র, কিন্তু আমি আমার জীবন-রক্ষককে কী করিয়া ভুলিব?"

আন্দ্রে কহিল "মাদেলিন—যদি সত্যই আমি তোমার জীবন-রক্ষা করিয়া থাকি, তবে সেইজন্যই তুমি আমাকে ভুলিবে এবং আমি তোমাকে ভুলিব না। যাহাতে সহজে ভুলিতে পার, সেই জন্যই তুমি আমাকে আজ স্বর্গের অধীশ্বর করিয়াছ। আমার চেয়ে বেশি কেহ জানে না আমি উহার কত অযোগ্য। কিন্তু উপকারের মতো দুঃসহ বোঝা আর কিছু নাই। তার শোধ দিতে না পারিলে বা আর কোনো উপায়ে সেটি ভুলিতে না পারিলে মানুষ ছট্‌ফট্‌ করে। আর উপকার যে করে সে ঋণটি চিরস্থায়ী করিতে চায়। তাহা যদি নাও পারে, তবে স্বহস্তরোপিত তরুর প্রতি মানুষের যে স্নেহ হয়, সেই শ্রেণীর একটি স্নেহ উপকৃতের প্রতি তাহার চিরদিন থাকে।"

এবার উঠিয়া গিয়া মাদেলিন ঘরের অন্য বাতিগুলি জ্বালাইল। তারপর আন্দ্রের কাছে আসিল; কিন্তু না বসিয়াই কহিল "আমার মনে হয় তুমি সেই শ্রেণীর লোক যারা পূর্ণিমা রাত্রিতে শুধু চাঁদের বিপরীত দিকটার কথাই ভাবে। সে দিকটা আছে সত্য, কিন্তু

তাহা কি সর্ব্বদা না ভাবিলেই নয়?"

আন্দ্রে উত্তর দিল "কিন্তু আলোক ভরা দিকটিও তো অখণ্ড সত্য নয়।"

"তাই বলিয়া সেটি ভোলাও তো উচিত নয়। আমার কী মনে হয় জান? তুমি শৈশবে মাতৃহীন, কোনো আত্মীয়ার কাছে মানুষ হইয়াছ। সে তাহার খুসী অনুসারে তোমাকে ভালোবাসিয়াছে, কখনো স্থায়ী স্নেহ পাও নাই। তোমার ভাইবোন ছিল না, ত্যাগের তৃপ্তি কখনো জান নাই। কৈশোরে তোমার বেশি সহচর ছিল না। কোনোদিনই তুমি খেলাধূলা বেশি কর নাই। খোলা আকাশকে ভালোবাস নাই। চিরদিন নিজের হৃদয়কে লইয়া কোনো ঘরের কোণে দিন কাটাইয়াছ। বহুদিন অবধি নিরাশ হইবার ভয়ে কিছু আশা কর নাই, কিছু চাহিতে পার নাই। তারপর শুধু কাড়িয়া লইয়াছ, কাহারো দানের অপেক্ষা করিতে শেখ নাই। তোমাকে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় খুব প্রফুল্ল। কিন্তু তুমি শুধু হাসির জোগান দাও, তোমার মন হাসিতে শেখে নাই।"

এবার উঠিয়া গিয়া আন্দ্রে মাদেলিনকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মাদেলিন ধরা দিল না। মুগ্ধ কণ্ঠে আন্দ্রে কহিল —"জানিতাম তুমি মায়াবিনী, তবুও এত খবর তুমি কী করিয়া জানিলে? ইহার প্রত্যেক কথাটি সত্য। হয়তো আমারি দোষ, কিন্তু জীবনে স্থিরভূমি আমি পাই নাই। স্রোতের শৈবালের মতো ভাসিয়া চলিতেছি। কোথায় চলি, কিসের আশায় চলি, তাহাও অনেক সময় ভাবিয়া পাই না।"

এবার যেন সুপ্ত ফণিনী জাগিয়া উঠিল। মাদেলিনের এ কণ্ঠস্বর আন্দ্রের পরিচিত নয়। মাদেলিন বলিতেছিল—"কিসের আশায় ফ্রান্সের এ শত্রুতা সাধন করিতেছ, তাহা কি ঠিক করিতে পারিয়াছ? তোমার কাছে আমার দেশ কী অপরাধ করিয়াছে বলিবে কি?

তোমাদের জাতি আমাদের মিত্রশক্তি। বলিবে কি কোন প্রলোভনে, কোন স্থির ভূমির আশায়, এ ঘৃণিত ব্যবসায় ধরিয়াছ ?”

আগের রাত্রিতে যখন পায়ের কাছে বোমা ফাটিয়াছিল তখনো আন্দ্রে এত চমকিত হয় নাই। কিন্তু এখন তাহার দিশেহারা হইলে চলিবে না, তাই উত্তর দিল—

“ফ্রান্সের শত্রু আমি, মাদেলিন ?”

এবার মাদেলিন সহজ সুরে কহিল—“আর প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়ো না। ব্যবসায় তোমারও যাহা, আমারও তাই, শুধু পার্থক্য এই যে আমি এ কাজ দেশের জন্য করিতেছি।

তোমার সকল খবর কাল আমার কাছে পৌঁছায়। যে নামে তুমি চলাফেরা করিতেছ, তাহাও তাহাতে লেখা ছিল। তুমি এই অঞ্চলেই আছ, তাহাও আমরা জানিতাম, তবে ঠিক কোথায় আছ সে খবর আমাদের ছিল না। সে সব কাগজপত্র আমার হাতে ব্যাগের মধ্যে ছিল। গির্জ্জায় যখন আমার ভালো করিয়া জ্ঞান হয় তখন জানিতে পারি যে ব্যাগ আমার কাছে নাই। সেই স্থান অনুসন্ধান করিবার জন্য একলা ফিরিতে চাই। কিন্তু তোমার সম্মুখে করিব না বলিয়া তুমি অদৃশ্য না হইলে গির্জ্জার সিঁড়ি হইতে আমি উঠি নাই। ফিরিয়া গিয়া সে ব্যাগ আমি খুঁজিয়া পাইয়াছি।

তখনো জানিতাম না তুমি এই লোক কি না। তোমাকে যে আসিতে বলিয়াছিলাম সে সত্যই আমার রুক্ষ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিতে। কিন্তু তোমার নাম ও রেজিমেণ্ট যখন বলিলে, তখন আমার আর সন্দেহ রহিল না। শুনিলে বিস্মিত হইবে যে ঐ নামের অফিসারটি আজ এক সপ্তাহ হইল নিহত হইয়াছে। কিন্তু তোমার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, তুমি ঘৃণার পাত্র নও, তুমি দয়ার পাত্র।”

অন্য সময়ে হয়তো আন্দ্রে নিজেকে বাঁচাইবার আরো চেষ্টা করিত। কিন্তু মাদেলিনকে দেখিয়া তাহার প্রতীতি হইয়াছিল যে সে মন

একেবারে ঠিক না করিয়া কোনো কাজ করে না। তাই শুধু জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমি এখন কী করিতে চাও?"

তেমনি সহজ সুরে মাদেলিন উত্তর দিল "তোমাকে ডাকিয়া আমি ধরাইয়া দিতে চাহি না। সন্ধ্যাবেলায় তোমার হোটেলে যাইবার সময়ে দেখিয়াছি যে খুব আস্তে গেলেও এখান হইতে সেখানে পৌঁছিতে পনেরো মিনিট লাগে। যদি কোনো কারণে দেরি হয়, সেই জন্য আরো পনেরো মিনিট আমি অপেক্ষা করিব। তুমি এস্থান ছাড়িবার ঠিক আধঘণ্টা পরে মিলিটারী পুলিশ তোমার খবর পাইবে—তারপর তোমার অদৃষ্ট।"

আন্দ্রে কোনো উত্তর দিল না। শুধু মাদেলিনের চোখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাদেলিন দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল না। এবং কহিল "আমাকে অযথা নিষ্ঠুর মনে করিয়ো না। তোমার নিকট আমার যাহা ঋণ তাহা আমার শোধ দিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার এ ধূলি-ধূসরিত দেহের আজ কোনো মূল্য নাই। তবু তোমাকে যাহা আজ আমি দিয়াছি, এ জীবনে আর কাহাকেও তাহা দিতে পারি নাই। দিতে চাহিয়াছিলাম একজনকে—সে গ্রহণ করে নাই।

তাহারি সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক ছিল।—যুদ্ধ বাধিতেই এবং তাহার ডাক না পড়িতেই সে যুদ্ধে যোগ দেয়। যে রাত্রিতে চলিয়া যায়, সেই সন্ধ্যায় আমি তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলাম। সে কোনো দিনই বেশি কথা কহিতে জানিত না। শুধু বলিয়াছিল 'মাদেলিন পারিতাম, যদি তোমাকে আর একটু কম ভালোবাসিতাম। ভয় করিয়ো না, আমি ফিরিয়া আসিব।' কিন্তু সে আর ফেরে নাই। ঐ যে ছবি দেখিতেছ উহা আমাদের গ্রামের ছবি। উহার একটি গাছও আজ নাই। ঐ গ্রামের প্রত্যেক ধূলি-

কণাটি ফরাসী রক্তে রঙ্গীন হইয়া গিয়াছে। আমার দুই ভাই ছিল—একজন মরিয়াছে, আর একজনের দুই চোখ গিয়াছে। আমার প্রৌঢ় পিতা চুলে কলপ লাগাইয়া, বয়স কম দিয়া যুদ্ধে যোগ দেন। তিনিও আর ফেরেন নাই। শুধু সান্ত্বনা এই যে যুদ্ধের এক বৎসর আগেই আমার মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন।

এখন হয়তো বুঝিবে ফ্রান্সের কোনো শত্রুকে আমি কেন ছাড়িয়া দিতে পারি না। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে সেই শত্রুই আমার জীবন-রক্ষক। সে জীবন আমি তোমাকে ফিরাইয়া দিতেছি। যদি বিনা শব্দে আমাকে হত্যা করিয়া যাইতে পার, যাও। কিন্তু আর কিছু করিবার চেষ্টা করিয়ো না। এই বাড়িতেই মিলিটারী পুলিশের লোক আছে এবং এই ঘর না ছাড়িয়াই আমি তাহাকে যে কোনো মুহূর্তে ডাকিতে পারি। কিন্তু নিশ্চিত জানিয়ো যে যে জীবন এই দেশ আমাকে দিয়াছিল সেই জীবন লইয়া আমি বাঁচিয়া রহিব, আর সেই দেশের মহাশত্রু তুমি, তুমি মুক্তি পাইবে সেই জীবন রক্ষা করিয়াছ বলিয়া, এ অসম্ভব।"

মাদেলিন থামিল। তাহার কথায়, চোখে মুখে কোনো উত্তেজনা ছিল না। যে পথ সে ধরিয়াছে সেই যেন তাহার একমাত্র পথ। তাহাতে তাহার দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, সন্দেহ নাই।

এবার আন্দ্রে কথা বলিল। কহিল "তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে, দিবে কি?"

মাদেলিন ভ্রূ তুলিয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল "কী?"

আন্দ্রে বলিল—"তোমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিব এত শক্তি আমার নাই, আর তাহা আমি করিতেও চাই না। এ কাজে কী বিপদ তাহা জানিয়া শুনিয়াই যখন এ কাজে হাত দিয়াছি, তখন আজ আমার আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। কাল দ্বিপ্রহরের আগে হয়তো যাহার জীবনের অবসান হইবে, তোমার কাছে তাহার মিথ্যা

কথা বলিবার কিছু কারণ নাই। তোমাকে আমি ভালোবাসিয়াছি। বহু দিন বহু নারীর কাছে এ কথা বলিয়াছি কিন্তু তখনো জানি নাই ভালোবাসা কী! পৃথিবীতে আমার এই শেষ রাত্রিতে আমার সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ রাখিতে দাও। কাল ভোরে তোমাদের বাড়ি ছাড়িলেই তুমি তোমাদের কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়ো।"

মাদেলিন ততক্ষণ মেজেতে কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িয়াছে! আন্দ্রে দেখিল সে অন্যদিকে চাহিয়া আছে এবং তাহার চোখের কোণে দু'বিন্দু অশ্রু। আন্দ্রের কথার উত্তরে মাদেলিন কিছু বলিল না। মেজে হইতেই হাত দিয়া আন্দ্রেকে নিজের কাছে টানিয়া লইল।

প্রত্যাসন্ন মৃত্যু আন্দ্রের রক্তে যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। আগে কখনো সে জানে নাই সুখের মর্ম্মস্থলে এত বেদনা। এক একবার মনে হইতেছিল আর তাহার নূতন করিয়া মরিতে হইবে না। সে মরিয়াছে, মাদেলিন মরিয়াছে। তাহাদের নিবিড়তম আলিঙ্গন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিদ্বার খুলিয়া দিয়াছে। কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই যে তাহারই মতো রক্ত-মাংসে গড়া, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভরা, ও সুখে-দুঃখে মানুষ একটি নারীর মধ্যে এ অনন্ত বিস্ময় থাকিতে পারে। সে বিস্ময়ের গোপন উৎস যেন তাহারই স্পর্শ অপেক্ষা করিয়া আছে এবং সেখানেই পৌঁছিতে পারিলে যেন সে বুঝিতে পারিবে সৃষ্টির প্রহেলিকা, নরনারীর আকর্ষণ, জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব ও দেহ-মনের একাত্মতা। সেই ইশারাই ছিল বুঝি প্রভাতের তরুণ আলোয় দেখা মাদেলিনের যৌবন-কোমল বাহুদুটিতে। সেই বাহুর আহ্বান তাহাকে আনিয়াছিল এই মৃত্যুর অভিসারে এবং নিয়া চলিয়াছে মাদেলিনের অন্তরের অন্তরে যেখানে মণিময় মঞ্জুষায় রহিয়াছে সেই গোপন কথাটি যাহা যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানুষ খুঁজিয়াছে কাব্যে, চিত্রে ও সঙ্গীতে।

ঘরের বাতি তখনো জ্বলিতেছিল। নীল-সবুজ আলো। যেন সমুদ্র-গর্ভে কোনো মৎস্যকন্যার বিলাস-কক্ষ। আন্দ্রে দেখিল শ্রান্তি-নিমীলিত-নয়না মাদেলিনের একটি হাত তাহারই কণ্ঠলগ্ন। তাহারই দেহের উপর দুলিতেছিল মাদেলিনের নিশ্বাস-চঞ্চল বক্ষ—যেন তালে তালে উঠিতেছিল আরম্ভ-অবসানের, বাসনা ও বিরাগের এক অশ্রুত সঙ্গীত।

সহসা আন্দ্রের দৃষ্টি সোফাটির উপর পড়িল। হোটেল হইতে ফিরিয়া মাদেলিন এইখানেই তার টুপিটি খুলিয়া রাখিয়াছিল। টুপির কাছেই ছিল একটি হ্যাট্-পিন। তাহার পর যাহা ঘটিল, একটু আগেও আন্দ্রে তাহার কল্পনা করিতে পারে নাই। হাত বাড়াইয়া সে হ্যাট্-পিনটি লইল। মাদেলিনকে একটু দূরে সরাইয়া সে তাহার বক্ষে একটি গভীর চুম্বন করিল এবং মুখ উঠাইয়া সেই চুম্বন-সিক্ত অংশের কাছে হ্যাট্-পিনটি আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।

তখনো যেন আন্দ্রের তন্দ্রা ভাঙ্গে নাই কিন্তু এবার সে সত্যিই জাগিল। মনে করিল মাদেলিন বুঝি তখনই চীৎকার করিয়া উঠিবে, কিন্তু সে একটু অস্ফুট শব্দ করিল মাত্র। তারপর চোখ না মেলিয়াই অতি মৃদুস্বরে কহিল "বাতি নিবাইয়া দিয়া একটি জানালা খুলিয়া দাও।"

আন্দ্রে তাহাই করিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে মাদেলিন কহিল "কাছে এস, আস্তে আসিও, নীচের লোক যেন না জাগে।"

আন্দ্রে কাছে আসিল। মাদেলিন এবার অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল "কী করিয়া জানাইব আমি তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ।"

তারপর কয়েক সেকেণ্ড সব স্তব্ধ। অকস্মাৎ মাদেলিন কহিল "O, the air of France."

মাদেলিনের সেই শেষ কথা। আন্দ্রে উঠিয়া গিয়া জানালা বন্ধ করিয়া আবার বাতি জ্বালাইল। দেখিল মাদেলিনের বক্ষ হইতে

একটি ক্ষীণ রক্ত-ধারা কার্পেটে নামিয়াছে, গণ্ডের আরক্ত আভা মিলাইয়া গিয়াছে, দেহ শীতল।

অনেক ভয়াবহ মৃত্যুর দৃশ্য আন্দ্রেকে দেখিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহারই রচিত এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজেকে সংযত না রাখিলে সে তখনই পাগল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে। কী ছিল কয়েক মিনিট আগে ঐ দেহের মধ্যে—কোন যাদুমন্ত্রে ফুটিয়াছিল ঐ দেহে রূপ আর তাহার দেহে ক্ষুধা। ঐ অসাড় বাহুদুটি কিছুক্ষণ আগে তাহাকে কী নিবিড় বাঁধনে বাঁধিয়াছিল, কখনো লতার মতো কোমল, কখনো নাগ-পাশের মতো কঠিন। কিন্তু এত ভঙ্গুর—একটি হ্যাট্-পিনের স্পর্শ আর সব ফুরাইয়া গেল!

মাদেলিনের বিস্রস্ত কেশরাশি হইতে তখনো সৌরভ আসিতেছিল, আর তাহার সহিত মিশিতেছিল রক্তের তীব্র গন্ধ। আর সহ্য করিতে না পারিয়া আন্দ্রে বাতি নিবাইয়া দিয়া মাদেলিনের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

স্থির হইয়া তাহার অনেক বিষয় ভাবা প্রয়োজন। ভোরের আগে তাহার এ বাড়ি ছাড়া অসম্ভব। যদি নিঃশব্দে বাহিরে যাইতেও পারে, তবে ঘরের দরজা খোলা রহিবে। যদি কোনো পরিচারিকা বা আর কেহ এ ঘরে ভোরের আগেই প্রবেশ করে। এ দিকে ভোরের আগে কোনো ট্রেনও নাই। সুতরাং হোটেলেও তাহার ফেরা অসম্ভব।

কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে হইতেছিল এ হত্যায় সে নিমিত্তমাত্র। ইহা মাদেলিনেরই কোনো অলৌকিক শক্তিতে ঘটিত হইয়াছে। দেশের মহাশত্রুর কাছে সে ঋণী থাকিতে চাহে নাই। তাহাকে ধরাইয়া দিতেও তাহার মন সরে নাই। সুতরাং তাহারি রক্ষিত জীবন তাহারই হাতে শেষ করাইয়াছে। নতুবা হত্যার

অব্যবহিত পূর্ব্বে অবধি এ কল্পনা তো তাহার মনে আসে নাই। হঠাৎ একটি শব্দ শুনিয়া আন্দ্রে যেন কাঁপিয়া উঠিল। একটি ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে মানুষের এত আতঙ্ক হইতে পারে, আন্দ্রে কখনো ভাবিতে পারে নাই। অথচ শব্দটি ঘরের কোণে একটি তিপয়ের উপরে রাখা ঘড়ির ছাড়া আর কিছুই নয়। টিক্ টিক্ টিক্—তার স্নায়ুজালে যেন ছুরির মতো ঐ শব্দ বিঁধিতেছিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল উঠিয়া গিয়া কোনো রকমে ঘড়িটি বন্ধ করিয়া আসে। টিক্ টিক্ টিক্—ও শব্দ-ধারা যেন মাদেলিনের বুকের রক্তধারার মতো, প্রতি মুহূর্ত্তে মরণকে নিকটতর করিতেছে। ততদিনই আন্দ্রে শুধু বাঁচিয়াছিল যতদিন সে ছিল শুধু বিধাতার মনের স্বপ্ন। জন্মের পর মুহূর্ত্ত হইতেই তো মৃত্যুর পথ-যাত্রা। এ স্রোতে কি উজান বহে না?

তাহার সমস্ত শক্তির প্রয়োজন—কিন্তু শক্তি কোথায়। আন্দ্রে মনে মনে কহিল "আমার পাগল হইবার দেরি নাই। গুপ্তচর আমি, ধরা পড়িতেছিলাম হত্যা করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছি, আর মনের দুর্ব্বলতায় নানারূপ উদ্ভট কল্পনা করিতেছি।"

এই চিন্তার ধারা তাহার মনে কিছু স্বস্তি আনিয়া দিল। মাদে-লিনের প্রসাধনের টেবিলের উপরে একখানা বই পড়িয়াছিল। আন্দ্রে উঠাইয়া দেখিল বইখানি লা ব্রুইয়ের্-এর রচনা হইতে একটি সঙ্কলন। একটি পাতার কোণ ভাঁজ করা রহিয়াছে। বইখানি খুলিতেই সেই পাতাটি চোখে পড়িল। লা ব্রুইয়ের বলিতেছেন "জীবনে সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার ধন হয় মেলে না, না হয় যখন বা যে অবস্থায় মেলে তখন আর তাহার সুখ দিবার শক্তি নাই।"

এতক্ষণ পরে একটি গভীর বিষাদে আন্দ্রের মন ভরিয়া গেল। কী ছিল এ মেয়েটির শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার ধন,—কে জানে কী ছিল তাহার নিশীথের স্বপ্ন। কী সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইয়াছিল সে এই

কয়টি ছত্রে ?

তাহাকে বেশিক্ষণ ভাবিতে হয় নাই। কিছুক্ষণ পরেই গির্জ্জায় 'এঞ্জেলাস্'-এর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আন্দ্রেও বাহির হইয়া ষ্টেশনের পথ ধরিল।"

ইহার পর 'রেস্তোঁরা-কার'-এ আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা ছিলাম, কিন্তু আমার সহযাত্রী আর বেশি কথা বলেন নাই। তাঁহার কথার আতসবাজি যেন পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। তুএকবার কথা কহিতে চেষ্টা করিয়া 'হাঁ' 'না' উত্তর পাইয়া বাহিরে চাহিয়াছিলাম। সে দিন রাত্রিতে চাঁদ ছিল না, কিন্তু তারায় তারায় ভরিয়া গিয়াছে। আর মনে হইতেছিল যেন তাহারা অনেক নীচে নামিয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ বন্ধু কহিলেন—

"কী সুন্দর তারা-ভরা আকাশ, নয় কি ? ট্রেনে যাইতে যাইতে, বা কোনো হোটেলে থাকিবার সময় অনেক দিন আমার মনে হইয়াছে, আমরাও প্রত্যেকে ঐ তারার মতো। মনে হয় যেন উহারা পরস্পর কত কাছে কাছে। কিন্তু শোনা যায় একটি হইতে আর একটি লক্ষ যোজন দূরে। কিন্তু তবু কি জানো, সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে এই ক্ষণিকের সহযাত্রীরাই মানুষের সত্যকার দরদী। আর দেখা হইবে না বলিয়াই তাহাদের কাছে অনেক কথা বলা যায়।"

কী একটি সন্দেহ অগোচরে আমার মনের মধ্যে আসিতেছিল, এতক্ষণে তাহা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ঠিক মনে হইতে লাগিল যে আমার সহযাত্রীই সেই আন্দ্রে, অন্য লোকের নাম করিয়া নিজের কাহিনীই বলিয়াছেন।

পরখ্ করিবার অবসর পাইলাম না। সহযাত্রী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন—কহিলেন "ইহার পরের ষ্টেশনে এ গাড়িখানা খুলিয়া রাখিবে। ইতালীতে প্রবেশ করিলে নূতন 'রেস্তোরাঁ-কার' এ

ট্রেনের সহিত জুড়িয়া দিবে। তোমার পাসপোর্ট, ট্রাঙ্কের চাবি ও টিকিট কণ্ডাক্টার-এর কাছে দিয়া রাখিয়ো, তাহা হইলে ফ্রান্স ছাড়িবার সময় আর উঠিতে হইবে না। এবার বিদায়, বন্ধু, জীবনে যত সুখ-সৌভাগ্য, তোমার হউক।”

চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার চোখ দুটি আবার সেই কৌতুকোজ্জ্বলতা ফিরাইয়া পাইয়াছে।

নিজ কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলাম।

ক্লান্ত ছিলাম, ঘুম আসিতে দেরি হইল না। কিন্তু সে ঘুম তেমন গভীর নয়। রাত্রিতে একবার মনে হইল যেন আমরা পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছি। ছেলেবেলার একখানা বইয়ে সূর্য্যের দূরত্ব বোঝাইবার জন্য এক একস্‌প্রেস্‌ ট্রেনের কথা ছিল। মনে হইল এ সেই ট্রেন। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিবে। আমি ফুরাইব, আমার সাথীরা ফুরাইবে, কিন্তু ট্রেন চলিবে, নূতন যাত্রী আসিবে। সেই ট্রেনে রহিয়াছি এই মনে করিয়া এক অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে মন ভরিয়া গেল।

রাশিয়ান ক্যাট

জ্যোতির্মালা দেবী

আমার সাত-বছরের ভাই-পো টুনুর বেড়াল পুষবার সখ হয়েছে। আমি বাড়িতে বেড়াল আনতে দিই না, তাই ও পাশের বাড়ির মাসিমার আঁচল ধ'রে টেনে আমার কাছে নিয়ে এসেছে ওকালতি করতে ওর হ'য়ে। আমি পড়ছিলাম, মুখ তুলে বললাম—"কি টুনু, কি চাই?"

—"মিনি, কাকাবাবু।"

চম্‌কে বললাম—"মিনি?"

মাসিমা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। তাঁদেরই হ্যাম্পস্‌টেডের বাড়ির একটা বেড়ালছানা—আব্দার ধরেছে ওর চাই-ই। এরই মধ্যে নামটামও দেওয়া হ'য়ে গেছে। অন্যমনস্কভাবে বললাম—"আচ্ছা, দেখি।"

হাতের বইখানা মুড়ে রেখে কত কথাই ভাবতে লাগলাম। মনে হলো—যখন '—' ইউনিভার্সিটির জমকালো ডাক্তারি ডিগ্রি নেবার জন্যে প্রথম বিলেত যাই, সঙ্গে ছিল অপর্ণা। ও তখন বেড়াল মোটে দেখতে পারত না। ছোট থেকে নাকি এই প্রাণীটার ওপর ওর দারুণ বিতৃষ্ণা। তার কারণ আমাকে যা বলেছিল তা সংক্ষেপে এই :

ছেলেবেলায় ও ছিল বড় কাঁদুনে, একবার কাঁদতে আরম্ভ করলে থামায় কার সাধ্য? কোনো খাবারের লোভে ভুলবে না, ধমকানিতে

দমবে না। ভারি একরোখা জেদী মেয়ে। একদিন তেমনি কেঁদে চলেছে—ওর এই একঘেয়ে এঁ—এঁ—সুরের কান্না মা, খুড়ি, জ্যেঠাই সকলের কানে স'য়ে গেছে। যতক্ষণ ইচ্ছে প্রাণভ'রে কাঁদবার সুযোগ দিয়ে ওকে মাটিতে ফেলে রেখে যে যার কাজ ক'রে যায়। কে একটা মেয়েকে নিয়ে দিনরাত মল্লের মতো কুস্তি লড়বে? মস্ত একান্নবর্ত্তী সংসার, ছেলে-মেয়ে আরো আছে—তাদেরও তো দেখতে হয়। কেবল, বড় বেশি অসহ্য হলে এক একদিন মা কাজ থেকে উঠে এসে পিঠে কষে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে যান: কিন্তু ঠাকুরমার জন্যে—দু-এক ঘা দিয়ে যে বিমল সুখ, তা-ও পাবার জো নেই। মেয়ের দ্বিগুণ জোরে চেঁচামেচি শুনলেই বকতে সুরু করেন—"মেয়ে কি বানের জলে ভেসে এসেছে লা? বড় যে মনের মতন হাতের জোর পরখ করছিস পিঠের ওপর? ঘর-সংসার আমরাও করেছি, ছেলেপুলেও যে মানুষ করিনি তা নয়। তাই ব'লে যেখানকার যত ঝাল কই—কচি পিঠের উপর তো ঝাড়িনি!"—মা রাগে মুখ কালো ক'রে গোঁজ হ'য়ে থাকেন, কিন্তু শাসন করবারও আর কোনো উপায় খুঁজে পান না। যাহোক, কি বলছিলাম—হ্যাঁ, একদিন ওম্নি কান্নার সময় রান্নাঘরের পেছনে আঁস্তাকুড়ের পাশে দুটো বেড়াল সংলাপ করতে করতে ভয়ানক জোরে 'ফ্যাঁশ' ক'রে ওঠে। যেই সে ডাক শোনা, অম্নি ঠাকুরমার আদরিণী দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ খুকীর অত যে কান্না—সব মুহূর্ত্তে ঠাণ্ডা। মায়ের আঁচলখানি চেপে ধ'রে কতক্ষণ যে ভয়ে কেঁপেছিল, এখন সে-কথা বলতে গেলে অপর্ণা হেসে গড়িয়ে পড়ে।—তখন থেকে কিন্তু হুলো ডেকে ওর কান্না থামানো বাড়ির সকলের অভ্যাস হ'য়ে গেল। বেচারি একটু সুর ধরতে না ধরতে চারদিক থেকে সবাই—"ডাকব তবে হুলোকে? —অনিল, ডাক ত ওটাকে—ম্যাও ম্যা—ওঁ—ওঁ—" অপর্ণা তখনি চুপ।

ছ-সাত বছরের মেয়ে হয়েও ও খাঁটি হুলোর ডাক আর নকল হুলোর ডাকে তফাৎ বুঝতে পারত না। মাষ্টারের কাছে পড়া সারা ক'রে বাইরের ঘর থেকে অন্দরে আসবার পথে সন্ধ্যায় ছোট ভাইটিও "হুম্—ম্যাও" করলে অপর্ণা রুদ্ধশ্বাসে ছুটে রান্নাঘরে কর্ম্মনিরতা মায়ের ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যা বকুনি খেত—! বড় হ'লে সমবয়সী মেয়েদের কাছে এর জন্যে কত হাসাহাসি টিটকিরি, কিন্তু বেড়ালের ভয় ওর আর ঘোচেই না। জ্বলজ্বলে চোখ দুটোকে অন্ধকারে ওর নাকি ভূতের চোখ মনে হয়; আমাকে বারবার বলে—"তুমি জানো না—বেড়ালের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ভূত-পেত্নি থাকে নইলে আমরা কেউ দেখতে পাই না, আর ওরা অমন পষ্ট দেখে ঘুরঘুট্টে আঁধারে ?"

শুনে আমার হাসি পায়, কিন্তু এসব বেশি আমল দিলে তো চলে না, অথচ সে—ই কবেকার ছেলেবেলার ভয় আর সংস্কার ওর মনে এমন বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে যে, সব জেনে-শুনেও বেড়ালকে ভূতের সামিল ভেবে এড়িয়ে চলে! মুখে ধমক দিয়ে বললাম—"কী ছেলে-মানুষি করছ—লোকে শুনলে বলবে কি? বেড়াল কেন দেখতে পায় আর তুমি পাও না, সে কি জানো না ?"

—"আহা, তা কি আর জানি না? কিন্তু ভাবো দেখি, রাত্তিরে উঠেছ, কালো কালির মতন অন্ধকারে তুমি কাউকে দেখছ না অথচ আলোর দেয়ালি জ্বলছে ওর চোখে, ও দেখছে তোমার স—বটা—খুব ভালো ক'রেই দেখছে—আমার ভাবতেও কেমন লাগে, কি আন্‌ক্যানি !"

—"যাও, যাও—আন্‌ক্যানি না ছা—ই। যতসব অনাসৃষ্টি কথা! আমি কিন্তু বেড়াল একটা আনবই তা ব'লে রাখলুম—ইঁদুরের উৎপাতে রাত্তিরে কেবলই ঘুম ভেঙে যায়, কাবার্ডে একটা খাবার জিনিস রাখা দায়—"

—"সেটা সারিয়ে নিলেই পারো ? তাহ'লে তো আর ঢুকবে না—"
—"ঢুকবে না, কিন্তু ইঁদুর তো থেকে যাবে ? তাকে নির্ব্বংশ করে কে ?"
—"কেন, ফাঁদ বসালেই পারো—"
—"হ্যাঁ, সারাদিন খেটে খুটে এসে রোজ আমি ফাঁদ পাততে বসি,—তোমার যেমন কথা ! ওসব চলবে না—বেড়াল একটা রাখতেই হবে ঘরে ! জেসি বলছিল পাশের মুদির দোকানে তিন-চারটে বাচ্চা হয়েছে—চাইলেই আমাদের একটা দেবে। আমি কালই মিষ্টার উইলিয়ামসনকে বলে রাখব—"
অপর্ণা কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলে—"ইঁদুর-টিঁদুর সব তোমার অছিলা—আসল কথা—তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে চাও মারতে। এখানে নোংরা করে রাখবে, ওখানটায় গন্ধ করবে, রাত্তিরে একা পথ চলতে পারব না ঘরের মধ্যেও বেড়াল একটা সঙ্গে সঙ্গে পায় পায় ঘুরবে—যখন-তখন গলায়—পার্-র্-র্ পার্-র্।"
আমি ওর হাত-দুখানি ধ'রে আদর করে বললাম—"আচ্ছা অনু, এই মিথ্যে ভয় ভাঙাবার জন্যেও তো একটা বেড়াল পুষে দেখা উচিত তোমার—"
—"বরং একটা কুকুর আনো তুমি—"
—"বাস্, দরকার বেড়ালের—আনতে হবে কুকুর !"
—"বেড়াল যা নেমকহারাম—"
—"নেমকহারাম কিসে ?"
অপর্ণা রাগ ক'রে বললে—"নয় ? বলো কি তুমি ? বাড়িতে তো বেড়াল কম ছিল না !—এই একরাশ এঁটোকাটা সামনে ধ'রে দিয়ে, সব পাট তুলে মা একটু শুতে গেছে, কিন্তু দুচোখের পাতা এক করবার জো কি ? কোনোদিন দুধের ডেকচি, কোনোদিন-বা মাছের কড়ার ঢাকনি উল্টিয়ে মুখ ডুবিয়ে—যার খায় তারই লোকসান।

আবার একটু পরে দিব্যি কোল ঘেঁষে কাপড়ে মুখ গুঁজে শোয়—যেন কিছুই হয়নি। নেমকহারাম না তো কি?—কিন্তু দেখেছ কখনো কুকুরকে ও-রকম করতে? যাকে ভালোবাসে, সে মারা গেলে দুঃখে প্রাণটাই দিয়ে দেয়—"

আমি হাসতে লাগলাম।—"তোমার ভালোবাসার আদর্শটা বড্ড উঁচু, অনু—সাধারণ লোকে নাগাল পাবে না। যে বেচারি তোমায়—"

—"হয়েছে, থামো। আবার ওই নিয়ে স্বরু কোরো না এখন। কিন্তু বেড়াল তুমি কিছুতেই আনতে পারবে না, তা ব'লে রাখছি। তোমার কি, তুমি তো সারাদিনই বাইরে বাইরে ঘুরবে। একলা বাড়িতে একটা অদ্ভুত জানোয়ারের হাঙ্গাম পোয়াতে হবে তো আমাকেই।"

অগত্যা বেড়াল আনবার প্রস্তাবের এখানেই ইতি করতে হয়। ওই বিদেশে কুকুর-বেড়াল পুষে ঘর-সংসার ফেঁদে বসাই যে আমার মতলব ছিল, তা নয়। বাস্তবিক, ফ্ল্যাটে ইঁদুরের উৎপাতের জন্যেই আমাকে বাধ্য হ'য়ে ও-কথা তুলতে হয়। তারপর অপর্ণার এই অনর্থক বেড়াল-বিদ্বেষ দেখে আমার কেমন একটা জেদ এসে গিয়েছিল যে, এটা ভাঙতেই হবে। কিন্তু চোখে জল দেখে, ওর দুর্ব্বলতা ঘোচাবার ম'ত উৎসাহ আমি নিজের মধ্যে আর খুঁজে পেলাম না। আমাকে সকাল সাতটার আগে প্রাতরাশ সেরে একটা পর্য্যন্ত হাসপাতালে, লাইব্রেরীতে, ক্লাসে—যখন যেখানে ডাক পড়ে, যেতে হয়। সারাদিন মড়া ঘেঁটে রোগী দেখে বেড়াই। একটায় বাড়ি ফিরে লাঞ্চটি কোনোমতে গলাধঃকরণ করে আবার ছুটতে হয়। আসতে যেতে মাঠটা পার হতেই আমার অবসর-ঘণ্টার অর্দ্ধেকটা যায় কেটে। বিকেলেও পাঁচটার আগে কদিনই বা বাড়ি ফিরতে পারি? সারাদিনটা অপর্ণাকে একলা থাকতে হয়, সেকথা ঠিক। বেড়াল যদি ভালো লাগত, সেটা সঙ্গে থাকলে খুসি হবার কথা ওরই, কিন্তু ভালো যখন বাসেই না, নিঃসঙ্গ বাড়িতে সেটা ওকে

অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে মাত্র। সাত-পাঁচ ভেবে মনে মনে বললাম—যাক্‌গে, একটা ফাঁদই না-হয় কিনে আনব।

দিন-দুই পরে দুপুরে খাবার সময় অপর্ণা একটু ইতস্তত ক'রে বললে—"জেসি বলছে, দেখাশুনা যা করবার ও-ই করতে পারবে। আর, প্রথম থেকেই অভ্যেস করালে নাকি তেমন বিরক্তও করে না—রান্নাঘরেই আগুনের ধারে থাকবে চুপচাপ শুয়ে—"

অন্যমনস্কভাবে বললাম—"কে থাকবে শুয়ে?"

অপর্ণা মিছামিছি রেগে উঠে বললে—"বা রে, এরই মধ্যে ভুলে গেলে নাকি?"

—"তা, তুমি আর একটু বিশদ ক'রে না বললে স্মরণ তো হচ্ছে না—সুশীল নাকি?"

অপর্ণা শাসিয়ে বললে—"আমার দাদার তো ভারি দায় পড়েছে তোমার রান্নাঘরে এসে শুয়ে থাকতে। সাধে কি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না খাবার সময়? এদিকে খাচ্ছ আর মনে মনে হাস-পাতালের কথা ভাবছ।—যখন-তখন যাকে তাকে নিয়ে—"

—"আচ্ছা, আচ্ছা—আর বলব না। বাপ, যেন আগুনের ফুল্‌কি, খপ ক'রে এত গরম হ'য়ে উঠতেও পারো তুমি!"

—"গরম হই সাধে? আমি এলুম কাজের কথা বলতে—যাক এখন তোমার মত আছে কি না বলো।"

—"জান না তো ডাক্তারি পড়ার হাঙ্গাম কত! একটু-আধটু ঠাট্টা-তামাশা করতে না পেলে একেবারে যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' ব'নে যাই!"

—"কেন পড়তে এলে ডাক্তারি? কেউ তো মাথার দিব্যি দেয়নি—"

—"কী ক'রে জানলে দেয়নি? কিন্তু—কার কথা বলছিলে তুমি?"

—"বেড়াল গো বেড়াল! তোমার সাধের ম্যাস্কট। পুষতে চাও তো নিয়ে এস গে এবার—"

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বললাম—"তাই বলতে হয় এতক্ষণ! কিন্তু সে তো চুকে-বুকে গেছে—"

অপর্ণা কথাটা কানে তুলল না।—"জেসি বলছে উইলিয়ামসন আর রাখতে চায় না—হয়ত কাউকে দিয়ে দেবে—"

—"আচ্ছা, আজ কলেজ থেকে ফেরবার পথে ব'লে আসব এখন! কিন্তু দেখো, তোমার অমতে আমি জোর ক'রে কিছু করতে চাই না—"

অপর্ণা একটা বিতৃষ্ণা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—"নাঃ, এনো। ওটা নিশ্চয় আমার ধার দিয়েও যাবে না, দেখো তুমি। জেসি বলে যে, ওরা নাকি ডিস্‌লাইক্ বুঝতে পারে।"

মুদি উইলিয়ামসনের ছোট মেয়ে লরা বেড়াল-বাচ্চাটিকে নিয়ে এলো। আমরা দুজনেই তখন বাড়িতে। লরা বেড়ালটাকে অনেকক্ষণ আদর ক'রে চুমো খেয়ে, বারবার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে শেষটা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় চ'লে গেল। বেচারি বোধহয় নেহাৎ বাপের ভয়েই বাচ্চাটিকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ও যেতেই অপর্ণা নাক-মুখ সিঁটকে ব'লে উঠল—"মাগো, ইংরেজ মেয়েরা যেন কী! ওই নোংরা কালো বেড়ালটার মুখে মুখ দিয়ে চুমো দেয়! দেখতে মোটাসোটা সুন্দর হ'লেও না-হয় বুঝতাম—এইঃ, যা, পালাঃ এখান থেকে—ওগো, তোমার বেড়াল সামলাও তুমি, নইলে ছুঁড়ে ফেলে দেব।"

আমার একটু রাগ হ'ল। এ কী রকম নিষ্ঠুরতা! গম্ভীরভাবে জেসিকে ডেকে বললুম—"ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে। আর দেখো, রোজ তুমি বাড়ি যাবার আগে ওটাকে রান্নাঘরে বন্ধ ক'রে যেয়ো, এঘরে বা শোবার ঘরে যেন ঢুকতে না পায়।"

জেসি ধরতে যেতেই বেড়ালটা ছুটে সোফার নিচে গিয়ে লুকোল।

জেসি এদিকে যায় তো ওটা যায় ওদিকে। শেষটা হায়রান হ'য়ে মুখ লাল ক'রে রুষ্ট স্বরে বললে—"এতটুক দেখতে বটে, কিন্তু এরই মধ্যে সয়তানি শিখেছ খুব। এটা ভোগাবে, ম্যাডাম—"

অপর্ণা এতক্ষণ চুপ ক'রে ব্যাপার দেখছিল। আমার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে উঠে এসে বললে—"সোফাটা সরাও দেখি জেসি, ধরো তুমি ওদিকটা, আমি এদিকে আছি।— শুনছ, এবার তুমি গিয়ে ওটাকে নাও।" সোফা সরাতেই বেড়াল ছুটে কাবার্ডের পেছনে গিয়ে ঢোকে। সেখান থেকে ওকে বা'র করে সাধ্য কার? লাঠি, ছাতা, 'পোকার'—হাতের কাছে যেখানে যা পাই তাই দিয়ে খোঁচাখুঁচি ক'রে দেখা গেল, কিন্তু ভয় দেখিয়ে কিছুতেই ওটাকে বের করা গেল না। জেসি ঘণ্টাকয়েকের জন্যে কাজ করতে আসে, যথাসময়ে চ'লে গেল।

পরদিন সকালে বসবার ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। দাঁড়ানো যায় না—এমন!—বাড়িতে আমিই সকলের আগে উঠি—জেসির আসতে এখনো ঘণ্টাখানেক। এই এতক্ষণ ওই—না, অপর্ণা উঠলে আর রক্ষা থাকবে না। তাছাড়া আমিই বা আজ ওখানে ব্রেক্‌ফাষ্ট খাই কী ক'রে?—না রান্নাঘরে গিয়েই বসি; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল ওটা তো কাল থেকে কিছুই খায়নি—দুধের লোভেও বেরিয়ে আসেনি, এত ওর ভয়। একবার গিয়ে দেখতে হচ্ছে—নইলে অতটুকু বাচ্চা—ক্ষিধেয় আর শীতে ম'রে যেতে কতক্ষণ?—শেষে সক ক'রে প্রাণিহত্যা করব? —ফিরতে দেখি অপর্ণা বাথ-রুমের দিকে চলেছে। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলে—"কি, জেসি তোমার খাবার ঠিক ক'রে রেখে যায়নি ও-ঘরে?" ব'লে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই ব্যস্ত হ'য়ে দেখতে গেল, কিন্তু দোরের চৌকাট থেকেই ছিটকে বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—"এত ক'রে বারণ করলুম—কিন্তু গরিবের কথা ফলে বাসি হ'লে—নাও,

সামলাও এবার ঠেলা—আমি বাপু চললাম সোজা স্নানের ঘরে।"
অপরাধী আমিই কাজেই বাধ্য হ'য়ে ঠেলা সামলাতে চললাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুরুশ, ছেঁড়া ন্যাকড়া যা পাই নিয়ে নাকে কাপড় দিয়ে চললাম। অপর্ণা পেছন পেছন এসে বললে—"ও কি, তুমি কি সত্যিই নিজের হাতে ও-সব পরিষ্কার করতে চললে নাকি ?"

—"তা না তো কি ?"

—"কেন, জেসি রয়েছে কী করতে ?"

—"তোমার যেমন কথা ! আজ ওকে দিয়ে এসব করালে কালই ভাগ্‌বে না ও ? মেড বদ্‌লে বদ্‌লে এমনিতেই তো হায়রানি—"

ওই আবহাওয়ার মধ্যে বেশিক্ষণ আর বাদানুবাদ না ক'রে লেগে গেলাম। অপর্ণা খানিক চুপ ক'রে থেকে আমার সাম্‌নে এসে হাত ধ'রে বললে—"দাও আমায়।"

অবাক হ'য়ে বললাম—"সে কি ?"

—"কিচ্ছু না—ক্লাসের দেরি হ'য়ে যাবে, যাও তুমি—"

—"কিন্তু অনু—"

অপর্ণা অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে—"বলছি যাও, কেন মিছে বকাচ্ছ আমাকে এই গন্ধের মধ্যে ?"

অগত্যা আমি রান্নাঘরে গ্যাস্-রিং জ্বালিয়ে চায়ের জল গরম করতে গেলাম। মনে মনে এত মায়া হয়—!—অপর্ণা চিরকালই ঐরকম—সেই ছেলেবেলা থেকে জানি তো ওকে! মুখে ঝগড়াঝাঁটি, চোখা চোখা কথা—যেন কত রাগ করেছে, কিন্তু ভেতরটা একেবারে ফুলের ম'ত কোমল। আমার ক্লাসের দেরি হ'য়ে যাওয়া ওর ছল, ও কাজ আমাকে করতে দেবে না—এই হ'ল আসল কথা। কিন্তু সে মনোভাবটা চাপা দিতে না পারলে ওর ভারি লজ্জা।
—উনুনে মস্ত দুই কেৎলী জল চাপিয়ে সাতপাঁচ নানান কথা

ভাবছি এমন সময় ও-ঘর হ'তে ডাক এলো—"শুনে যাও—"
—"ব্যাপার কি ?"
—"বেশি নোংরা করেছে এই কাবার্ডের পেছনে—ওটা না সরালে কোনো উপায় দেখছি না সাফ করবার—"
—"তাই তো তাহ'লে জেসি আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়—"
—"কিন্তু বেড়ালটা গেল কোথায়? পালিয়ে-টালিয়ে যায়নি তো?"
—"পালাবে কোথায় ? আছে ওইখানে কোথাও—"
—"কিন্তু দেখতে হবে না? সারাদিন কোণে কোণে লুকিয়ে থাক্—তারপর রোজ রাত্তিরে যতসব সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় এই কাণ্ড ক'রে বেড়াক্ আর কি। লোকজন এলে বসাবে কোথায় ? দুদিন পরে তোমার বাড়ির ছায়াও মাড়াবে নাকি কোনো ভদ্রলোক ?"
—"তুমিও যেমন পাগল ! ক্ষিদের জ্বালায় ওটা আপনিই বেরিয়ে আসবে—"
—"মনে তো হয় না। আচ্ছা, দেখই না বের করতে পারো কি না—"
এদিক-ওদিক খুঁজে দেখা গেল, বেড়ালটা পিয়ানোর নিচে পাদানির কাছ ঘেঁষে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে। হাত বাড়াতেই শুড়ুৎ ক'রে সোফার নিচে ঢুকে পড়ল। আর তাড়া না ক'রে বললাম—"থাক্ গে এখন, যত ছুটোছুটি করবে, ওটা ততই ঢুকবে কোণে গিয়ে।"
দুপুরে খেতে এসে দেখি বাচ্চাটাকে তখনও বা'র করতে পারা যায়নি। চিন্তিত হ'য়ে বললাম—"তাই তো, না খেয়েই মারা যাবে নাকি ?"
অপর্ণা হেসে বললে—"বিলিতি বেড়ালও 'কালা আদমী' চেনে না কি গো ?"
—"অসম্ভব নয়। যা মজ্জাগত প্রেজুডিস এদের।—কুকুর-বেড়ালেও ছোঁয়াচ লাগতে কতক্ষণ ?—আমি বলি কি অনু, বরং লরাকেই

ডেকে ফিরিয়ে দেওয়া যাক্—তুমিও তো আর সত্যিই বেড়াল ভালোবাসো না—"

—"তাহ'লে তো আপদ যায়। ওটা বিদায় হ'লে বাঁচি। কিন্তু জেসি বলছিল কি জানো? আস্তে আস্তে নাম ধ'রে ডাকলে নাকি বাগ মানতেও পারে—"

—"হয়েছে, ওর নাম জিজ্ঞেস করবার জন্যে ছুটতে হবে না কি আবার সেই মুদির দোকানে?"

অপর্ণার মুখে দুষ্টুমির হাসি।—"কেন, বেড়াল পোষার মজাটা একটু টের পেতে হবে না? হায়রান হ'লে চলবে কেন—এরই মধ্যে?" তারপর গম্ভীর হ'য়ে বললে– "আচ্ছা তুমি খেতে বসো। আমি দেখি, যদি কোনো মতে বের করতে পারি।" মনে মনে হাসলাম। কেন—বলছি পরে।—

অপর্ণা একখানা প্লেটে খানিকটা দুধ ঢেলে নিয়ে মেজেতে ব'সে বেড়ালছানাকে আহ্বান করতে লাগল—"পুসি, পুসি—টনি—ববী—চিচিং ফাঁক—?—নাঃ—কোনো নামেই তো সাড়া দেয় না—ভালো বিপদেই পড়া গেছে! এই লক্ষ্মীছাড়া বেড়াল কোথাকার—বেলেল্লামি রেখে আসবি তো আয় বলছি—জল্দি—নইলে দেবো হাড় গুঁড়ো ক'রে—

—"থাক্‌গে অনু, তুমি খেতে এসো এখন—"

—"দাঁড়াও। আয় মিনি—মিনি—মিনু!"

—"মি-উ!"

—"ওমা—সাড়া দিচ্ছে—দেখেছ? মিনু—মিনু—আয়, আয় মিন্—মিন্ মিনু!" প্লেটখানা সোফার কাছে রেখে আবার আরও নরম সুরে ডাকল—"মি-নু!"

—"মী—উ!"—ভয়ে ভয়ে মাথাটা একটুখানি বের ক'রে প্লেটে মুখ দিতেই খপ ক'রে অপর্ণা বললে—"ব্যস্, ধরেছি। হ'ল তো

এবার ? নাও তোমার বেড়াল—"
আমি হাতটা ঠেলে দিয়ে বললাম—"চাইনে এমন দুষ্টু বেড়াল—বলো জেসিকে ফিরিয়ে দিতে—"
—"এক্ষুনি তো আর ফিরিয়ে দিতে পারছ না ? ধরো ততক্ষণ—দেখো ছেড়ে দিও না যেন। আমি দড়ি নিয়ে আসি ও-ঘর থেকে।"—

বিকেলে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে অপর্ণা হঠাৎ বললে—"কোনো নামেই সাড়া দিল না— মিনু ডাকতেই বেরিয়ে এসেছে—ভারি মজা ! ওটার নাম মিনু নয় তো ?"
—"হবে।"
খানিকক্ষণ পরে অপর্ণা আবার বললে—"তা হ'লে মিনুই থাক্ ওর নাম ?"
কোটের বোতামের দিকে চোখ রেখে নিরুৎসুক কণ্ঠে বললাম—"নামটামে আর কাজ কি ? দিয়েই যখন দেব—"
—"হুঁ—"

দিন-দুই পরে একটু শীগ্‌গির ছুটি পেয়ে বাড়ী ফিরে দেখি—অপর্ণা সামনের সিঁড়ির রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশিনী মিসেস হল-এর সঙ্গে কি যেন বলছে। আমাকে দেখেই চুপ। মিসেস হল হেসে শুভ-সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—"আপনার স্ত্রীকে বলছিলাম, বেড়ালকে এখন থেকেই সব অভ্যাস না করালে পরে ভারি বেগ পেতে হবে—"
—"ও, তাই নাকি ? ধন্যবাদ—"
অপর্ণার চোখে চোখ পড়তেই সে মুখ ফিরিয়ে নিল।
ভেতরে আসতে বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে উঠল—"আমি তখনই জানতুম যে, এ বেড়ালের ঝক্কি সব পড়বে শেষটা আমারই

ঘাড়ে। মিসেস হলকে জিজ্ঞাসা না ক'রে করি কি ? কোণে কোণে নোংরা ক'রে রাখাটা কি খুব ভালো কথা ?"

—"নিশ্চয়ই না। কিন্তু ওটাকে যে ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল ? জেসি গেল না কেন ?"

ও মুখভার ক'রে বলে—"সে তুমি জানো, আর জানে তোমার জেসি। উইলিয়ামসনের তো ভারি ব'য়ে গেছে কি না একবার দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে। একটার বেশি বেড়ালকে খাওয়াবার খরচ গায়ে লাগে না ওদের ? যা কৃপণের জাশু সব—"

আমাকে বাধ্য হ'য়ে রোজ অনেক রাত জেগে পড়াশুনা করতে হয়। মাঝে মাঝে অপর্ণাও জাগে। এটা ওর খেয়াল, কিন্তু বারণ ক'রে দেখেছি—নিস্ফল। অগত্যা আমি হাল ছেড়ে দিই। খাবার ঘরে আগুনের কাছাকাছি টেবিল আর দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে যে যার কাজ করি। এগারোটা না বাজতেই অপর্ণা ঢুলতে সুরু করে এবং আস্তে আস্তে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। রো—জ। রাত জেগে পড়তেই পারে না ও—তবু-জেদ।—সেদিনও এমনি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে এক-একবার চোখ বুঁজে আসে। হঠাৎ চেয়ে দেখি, মিনু অপর্ণার চেয়ারের নিচে লুটিয়ে-পড়া লম্বা বেণীটা নিয়ে থাবা দিয়ে খেলা করছে। বেণীর আগায় বাঁধা দোদুল্যমান রঙীন রিবনের ফুলটাই ওর কৌতূহল উদ্রেক করেছে। এরকম খেলা করতে খুব ভালো লাগে কিন্তু ভয় হ'ল পাছে ও জেগে ওঠে—তাই আস্তে রুলারখানা দিয়ে এক তাড়া করতেই মিনু কিন্তু ভয়ানক ভয় পেয়ে তড়াক্ ক'রে একেবারে অপর্ণার ঘাড়ে। ও চম্‌কে জেগে ঝেড়ে ফেলে দিতে যায় ঃ কিন্তু মিনু ভয়ে চারখানা পায়ের সব কখানি ধারালো নখ বের ক'রে অপর্ণার কাঁধ আঁক্‌ড়ে ধ'রে রইল।

—"কি এত হাসছ বলো তো ? ভা—রি মজা—না ? শীগ্‌গির

ছাড়িয়ে দাও, নইলে কিন্তু খুন ক'রে ফেলব তোমার বেড়ালকে।"

—"বেড়াল আমার, না তোমার? আমার কোলে চড়তে দেখেছ একদিনও? ওটা তোমাকেই ভালোবাসে বেশি—"

—"চাইনে অত ভালোবাসা"—জোর ক'রে নামাতে গিয়ে মিনু আরো ভয় পেয়ে ওর ড্রেসিং-গাউন ধ'রে ঝুলতে থাকে।

শুতে যাবার আগে অপর্ণা মিনুকে আগুনের ধারে একটা কাঠের বাক্সে রেখে দিল।

বললুম—"ইস্ এ যে রাজশয্যা! এই-না তুমি বেড়াল ভালোবাসো না?"

—"ভালোবাসার জন্য তো এত কাণ্ড করিনি! বেড়াল যদি রাখতেই হয়—"

আমি নিরীহভাবে বললাম—"তাহ'লে লরাকে আর খবর দিয়ে কাজ নেই—রাখবেই যখন—কি বলো?"

অপর্ণা হেসে ফেলে বললে—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—রাখব। তুমি যে কতই খবর দিতে লরাকে তা কি আমি এঁচে নিইনি মনে করো নাকি? স—ব তোমার চালাকি—আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্যে বেড়ালটাকে।"

যাক—ফাঁড়া তো কেটে গেল উপস্থিত।

বাস্তবিক আমি জানতাম যে, অপর্ণা যখন দেখবে একটা প্রাণী বোবা—অসহায়—কেউ বরদাস্ত করতে পারছে না—যেন বাড়ি থেকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে—তখনই ওর দরদ হবে—দুর্ব্বলের উপর দয়ার্দ্র শক্তিমানের দরদ। বুদ্ধিমতী জেসিকে একটু ইসারা করতেই সেও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে অনাদর আর তাচ্ছিল্য দেখিয়ে মিনুকে দূরে রেখেছিল। বেড়ালটাও কম শেয়ানা নয়। ক্ষিদে পেলে অপর্ণার কাছে গিয়েই মি মি করে—ভুলেও আমার কাছে আসে না। ওরই পায়ের উপর মাথা ঘ'ষে, পার্-র্—পার্—

র্ ; সাম্‌নে শুয়ে প'ড়ে ডিগবাজি খেয়ে, কখনো বা চিৎ হ'য়ে চারটি পা উপরদিকে তুলে—ছোট্ট ঘাড়টি বেঁকিয়ে নরম ছোট্ট দেহে নানান ভঙ্গি ক'রে আদর কাড়বার সে কী হাজারো চেষ্টা ! অপর্ণার যখন-তখন-দোদুল্যমান বেণীখানি আর কোমল উষ্ণ কোলটির উপর মিনুর সব চেয়ে লোভ। সুবিধা পেলেই এই প্রিয় জিনিষ দুটি আক্রমণ ও দখল করবার আগ্রহের ওর সীমা নেই। ফলে, গোলাপী নাকের উপর তর্জ্জনীর তাড়নায় খানিক ক্ষণের জন্যে ওর সেই প্রথম-দিনকার দুর্গ কাবার্ডের নিচে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবার একটু পরে নিজেই বেরিয়ে আসে। আজকাল আর ওকে বের করবার জন্যে নানান ফন্দি-ফিকির খুঁজে বেড়াতে হয় না।

দেখতে দেখতে মিনুর গলায় বাঁধবার জন্যে রঙীন রেশমি ফিতে, লোম পরিষ্কার করবার বুরুশ, গায়ে মাখাবার পাউডার, খেলা করবার ছোট ছোট বল—কত কী যে আমদানি হ'তে লাগল ! দেখে-শুনে আমি তো অবাক ! একদিন থাকতে না পেরে বললাম—"এতও তোমার মাথায় আসে ! কী শোরগোলই তুলেছিলে প্রথম দিন যখন ওটাকে আনবার কথা বলেছিলাম—শুধু কাঁদতে বাকি—আর এখন এসব কী হচ্ছে ?"

—"দেখতেই তো পাচ্ছ। তুমি যখন বাড়ি থাকো না তখন ওটাই আমার একমাত্র সাথী বলতে সাথী, দোসর বলতে দোসর ;—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে ভালো লাগে কখনো ?"

—"তাই বলে পাউডার !"

—"পাউডার মাখালে মিনুকে কী সুন্দর যে দেখায়—দেখবে ? মিনু, মিনু—আয় এদিকে।······ব্যস্, এই দেখ এখন কেমন দিব্যি দেখাচ্ছে—এই, নড়িস্ নে দুষ্টু !"

যতবার পাউডার মাখায়, মিনু ততবারই গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেয়,

নয়তো তাড়াতাড়ি জিভ দিয়ে চেটে লোম পরিষ্কার ক'রে ফেলে। কিন্তু অপর্ণারও জেদ—মিনুকে পাউডার মাখিয়ে, গলায় লাল রিবন পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফাট পটের বিবিটির ম'ত ব'সে থাকতে শেখাবেই—তা মিনুর যতই কেননা আপত্তি থাক্।

—"ওগো, দেখছ, কান ম'লে দিলে ও ঠিক বুঝতে পারে যে, এমন একটা কিছু করছে যা আমি পছন্দ করি না। এমনি শাস্তি আর আদরের ভেতর দিয়েই আস্তে আস্তে সব অভ্যেস করাতে হয়—জানো?"

—"জানি, কেবল কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিতেই বা বাকি কেন এইটেই যা জানি না। ওটাকে তো বালগোপালের বিগ্রহের সামিল ক'রে তুললে। আসল কথাটা কি বলব?— তোমার মত মেয়েরা বড্ড এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট্। এই ঘেন্নার অন্ত নেই তো একটু পরে ভালোবাসায়ও নাজেহাল।"

—"তুমি বোধ হয় ভুলেই গেছ যে, ছোট থেকে বাড়িতে ওরা বেড়াল নিয়ে আমাকে কেবল ভয়ই দেখিয়েছে—কখনো কি একটু খেলা করবার সুযোগ পেইছি? গায়ে হাত বুলিয়ে একবার আদর পর্য্যন্ত না। অন্য কেউ করলে—যেমন আমার বোন চিনু—জানো তো ওর পেছন পেছন ছায়ে-মায়ে একপাল বেড়াল চলত দিনরাত? বেচারি কি ভালোই বাসত কুকুর বেড়ালকে!—আমার কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য লাগত যে, কী পায় লোকে বেড়ালের মধ্যে অত আদর করবার! হয়েছে কি—" অপর্ণা দম নিয়ে বলল, ওর খেই হারিয়ে—"আমার ঘেন্নাটা স্বাভাবিক ছিল না।"

—"কোনো ঘেন্নাই, স্বাভাবিক নয় অনি। কোন্‌টা ঠিক স্বাভাবিক আর সত্যিকার বৃত্তি আমাদের, তা যদি বলতে যাই, তুমি এখনই ব'লে বসবে—ঐ গো গুরুমশায়ের মত কপিবুক্ ম্যাক্সিম আওড়াচ্ছে দেখ! যাক্, তুমি যে খুসি হয়েছ, তাতেই আমি নিশ্চিন্তি! কিন্তু

দেখো, যত্ন আদর সবটার দখলী যেন একা তোমার মিনুর ভাগে না পড়ে—এই বেচারার—"
অপর্ণা ধমক দিয়ে বললে—"আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে—আর ফাজলামো করতে হবে না মশায়। তুমি পড়ো এখন, আমি মিনিকে নিয়ে ও-ঘরে যাচ্ছি।"

তারপরে—কত বছর হ'ল দেশে ফিরে এসেছি। বয়সের নদীতে জোয়ার ক্রমেই আসে টিমিয়ে, ভাঁটাই বুঝি বা একটানা হয় শেষে—তবু সেদিনের কথা মনে হ'লে আজও বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে! মনে হয়, মিথ্যে এ জীবন, ভুয়ো, জীবনের মালমশলা, কাণ্ড-কারখানা সবই বুঝি বা ভোজবাজি—মরুভূমির মরীচিকার মতই ক্ষণস্থায়ী। সেই অপর্ণা, সেই মিনু—আজ কে কোথায় যে! সেই আমিই কি আছি? অন্তরে বাইরে কত পরিবর্ত্তন!—হঠাৎ দেখলে অপর্ণাই হয়ত আজ ওর স্বামীকে ঠিক চিনতে পারত না—কে বলতে পারে?
তবু, চোখ বুঁজলে আজো মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাই '—' সহরে আমাদের সেই ছোট্ট ফ্ল্যাটখানা, তার প্রতি কক্ষ, প্রত্যেকটি আসবাবপত্র; জেসি, মিনু; অপর্ণার দুটি কাজল কালো অতল চোখ, হাস্যোচ্ছল তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, স্নেহ মধুর পরশখানি। ছোট্ট একটা বেড়ালছানা নিয়ে দুজনের সেই আমাদের ছেলেমানুষি ঘরকন্না, কথায় কথায় হাসি ঠাট্টা, অপর্ণার আদর-আব্দার, মান-অভিমান; ছুটির দিনে মাঠে-মাঠে, পাহাড়ে, নদীর ধারে—দূরে সমুদ্রের তীরে গিয়ে পিকনিক্।—ঝরণার জলের ম'ত গান গেয়ে গেয়ে স্বচ্ছ সুন্দর অবাধ-গতিতে ব'য়ে চলেছিল জীবনের ধারা। থেকে থেকে ভবিষ্যতের জন্যে কতই, জল্পনা-কল্পনা—তার একটা জীবন্ত টুকরোও কি আজ রইল না?—

জানি না কী গ্রহবৈগুণ্যে আমার খেয়াল হ'ল যে. নিউহেভ্‌নের কাছে সমুদ্রতীরে একটা ছোট্ট গ্রামে দিনকয়েকের জন্যে বেড়াতে যাবো। তখন আগষ্টের শেষ, ইংলণ্ডের গ্রীষ্ম (বা বসন্ত) অবসান-প্রায়, গাছের শুক্‌নো পাতা ঝরার সবে সুরু, হাওয়াতে পরিবর্ত্তন টের পাওয়া যায়, কিন্তু শীত আসবার এখনো দেরি। এখনো সারা সেপ্টেম্বরটা সাম্‌নে, অক্টোবরের আগে তেমন ঠাণ্ডা কি আর পড়বে? আকাশ এখনো সুনীল, সূর্য্যের কিরণ প্রায় তেম্‌নিই উজ্জ্বল, ফোটা ফুলের হাসির লয়ে 'সম্‌' আসে নি গৃহস্থদের উদ্যানে উদ্যানে। এই তো ওদের হেমন্ত—মোটে সুরু—যাওয়া ঠিক ক'রে ফেললাম। অপর্ণার তখন দারুণ ভাবনা হ'ল—ওর মিনুকে নিয়ে করা যায় কী? সঙ্গে নেওয়া তো অসম্ভব। বাড়িতে ফেলে যাওয়া মানে জ্যান্তো কবর দিয়ে রেখে যাওয়া—না খেতে পেয়ে মারা যাবেই। বাংলা দেশ নয় এ—যে পড়শীরা মাছের কাঁটাটুকুও জোগাবে! দুজনে মিনুর একটা আশ্রয় খোঁজবার জন্যে একবার উইলিয়ামসনের দোকানে, একবার বন্ধুদের বাড়িতে ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়াতে লাগলাম। অবশেষে আমারই এক সহপাঠী বন্ধু—ডাক্তার সাইগল—খবর দিলেন যে, ওঁর ল্যাণ্ডলেডি মিনুকে রাখতে রাজি—যদি তার খোরাকি দেওয়া হয়। অপর্ণা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি!—"ডক্টর সাইগল—মিনু—মাগো মা! এমন কথা শুনেছেন কোথাও? বেড়ালের ল্যাণ্ডলেডি! হি, হি—আবার খোরপোষ চায়—Board and Lodging for a Cat—রুম দেবে মিনুকে—একটা কাঠের বাক্স—হোঃ, হোঃ—খেতে দেবে কি? না, এক-পেনির হেরিং—ডক্টর—"

বেচারি সাইগল অপ্রস্তুতভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। আমি অপর্ণাকে একটু ধমক দিয়ে বল্লাম—"কী এত হাসো? হেরিং কেন খেতে দেবে? হেরিংএ কাঁটা কত ওরা জানে না?—আর পয়সা

না দিলে রাখবেই বা কেন শুনি—বেড়াল পুষতে খরচ নেই মনে করো নাকি ? ভুলে যেও না যে—"

"এটা বিলেত দেশ"—ধমক খেয়ে অপর্ণা হাসি চেপে চোখমুখ মুছতে মুছতে বললে—"না, ভুলব কেন ? ভুলিনি যে, এখানে পয়সাই হচ্ছেন সর্ব্বার্থসাধিকা। ভুলতে কি পারি ? তা, চলো—গিয়ে মিনুর ভবিষ্যৎ আবাস দেখে আসি গে। এই মিনু, চল্‌রে—দেখবি তোর নতুন আস্তানা—মনে ধরলে তবে তো। কিছু মনে করবেন না ডক্টর—"

—"বা, আমি কেন কিছু মনে করব মিসেস রায় ? এদেশে সব ব্যাপারেই এমন, জানেনই তো।"

আমি প্রাঞ্জল সুরে বললাম—"পয়সা না হ'লে ওরাই বা দুধ, মাছ এসব পাবে কোত্থেকে ? এক পেনিই হোক বা দু পেনিই হোক, নিজের পকেট থেকে দিতে সবারই গায়ে লাগে।"

অপর্ণা কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

ডাক্তার সাইগলের ল্যাণ্ডলেডির বাড়ি কাছেই। গেলাম তিনজনে মিনিকে নিয়ে। বরাবর তেতলায় ফ্ল্যাটে থেকে এসেছি—হঠাৎ রাস্তায় নেমে মিনুর যা ভয় !—লম্বা লম্বা নখ বার করে অপর্ণাকে আঁকড়ে ধরে রইল। মোটর চললে বা অন্য কোনো শব্দ হলে ঘাড় বেয়ে মাথায় চড়বার উপক্রম করে। ওর আঁচড়-কামড় সহ্য করে কোনোমতে টম—মিসেস টমের বাড়ি পৌঁছানো গেল। বুড়ি মিনুকে দেখেই বললে—"এ যে রাশিয়ান-ক্যাট্, তাই লোম অত লম্বা আর নরম—একেবারে 'ফার্-এর ম'ত।"

অপর্ণা বললে—"তাই নাকি ? আমি তো জানতুম পার্শিয়ান ক্যাট্ ব'লে এক জাত আছে—রাশিয়ান তো কখনো শুনিনি—"

"হ্যাঁ মিসেস্, আমি সব জানি—ছেলেবেলা থেকে—"

মিসেস টমের কথা শেষ হ'তে পেল না—হঠাৎ ঘরের মধ্যে ফোঁশ ফোঁশ শব্দ! ফিরে দেখি, মিনু, সজারু হয়ে পিঠ উঁচু করে যোদ্ধ-বেশে লেজ নেড়ে একটা কালো বেড়ালের পানে এক দৃষ্টে চেয়ে আর সে বেচারা ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে কোথায় লুকোবে ভেবেই পাচ্ছে না। মিসেস টম তাড়াতাড়ি সেটাকে কোলে তুলে নিয়ে সোফার এককোণে দিলে বসিয়ে। ডাক্তার সাইগল জনান্তিকে বল-লেন—"মিসেস টমের বেড়াল, মিষ্টার রায়। বুড়ি আপনাদের মিনুর ওর 'ব্ল্যাক্‌ফুটের ওপর নিষ্করুণ ব্যবহার দেখলে আর ওকে ঘরে ঠাঁই দিতে চাইবে না।"

কিন্তু মিনুকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা গেল না, যতবার ঠাণ্ডা করা হয়—ততবারই ও গিয়ে কালো-বেড়ালকে আক্রমণ করে আর কি। অবশেষে ডাক্তার সাইগল যা ভয় করেছিলেন, তা-ই হ'ল। টমদের ঘরে মিনুর ঠাঁই হ'ল না।

এদিকে আমাদের আর দেরি করবার উপায় নেই। অগত্যা কুকুর বিড়ালের "হোম"-এ (Cats' and Dogs' Home) টেলিফোন করতে হ'ল। সেখানে হারিয়ে-যাওয়া কুকুর-বেড়াল যেমন রাখে, তেম্‌নি—সপ্তাহে কয়েক শিলিং ক'রে দিলে—কোনো বাড়ির কর্ত্তা বা কত্রীর কোথাও যাবার দরকার হ'লে, তাদের পোষা জানোয়ারও রেখে দেয়।—একটা লরিতে অনেকগুলো খাঁচা নিয়ে "হোম" থেকে লোক এলো। ওদেরই একটায় মিনুকে ঢুকতে হবে। মিনু কিছুতেই খাঁচায় ঢুকতে রাজি নয়, শেষটা ড্রাইভার হর্ণ দিতে ভয় পেয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর লরি চলার সঙ্গে সঙ্গে মিনুর সে কী কাৎরানি আর চেঁচামেচি! অপর্ণা দুঃখিত হয়ে গার্ডকে ডেকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিলে যেন সাবধানে রাখে ও ভালো করে খেতে দেয়। সে তো খুব আশ্বাস দিয়ে চ'লে গেল

অপর্ণা বললে—"দেখ, মিনুটা গিয়ে ঘর যেন খালি হয়ে গেছে।

সারাদিন বাড়িতে ছোট্ট ছেলের মত দুরন্তপনা ক'রে বেড়াত। আজ দুপুরের গাড়িতে গেলেও পারতাম।"

—"না, বড্ড তাড়াহুড়ো হবে। কিন্তু একটা বেড়ালের ওপর এত মায়া, যখন—"

অপর্ণা হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে বললে—"থাক্ সেদিন আমার কখনো হবে না। কিন্তু মমতা মাত্রেই কত মারাত্মক দেখছ তো? আমার কেন জানি না, ভারি মন কেমন করছে—মনে হচ্ছে, না গেলেও হতো।"

তারপর?—

তারপর আর কি! নিউহেভ্নের কাছে সেই গ্রামে শুধু দশটা দিন আমাদের নিশ্চিন্ত আরামে কেটেছিল। আমরা একলা ছিলাম না—সঙ্গে আরো দু-একজন বাঙালী ছেলে মেয়ে। তাঁরা সকলে মিলে একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন—শুধু আমি আর অপর্ণা সমুদ্র-তীরবাসিনী এক বৃদ্ধার কুটীরে দুখানি ঘর নিয়ে একটু দূরে থাকতাম। সারাদিন দলের সঙ্গে এখানে ওখানে- কখনো ব্রাইটন, কখনো নিউহেভ্নে ঘোরাফেরা ক'রে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে স'রে পড়তাম এবং নির্জনে সমুদ্রতীরে গিয়ে চুপ ক'রে শুনতাম তার নীল কল্লোল। অন্ধকারে কখনো বা ঝড় মতন উঠলে সমুদ্রের গর্জন ও মাতাল হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দে ভয় পেয়ে এক একদিন অপর্ণা ব্যাকুল বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরত। স্বপ্ন ভেঙে আমি ওকে কাছে টেনে নিতাম!—"ভয় কি অনু, ভয় কি—"

—"ওগো—"

—"সত্যেন বলো—সত্যেন—এখানে তো আর কেউ শুনছে না।"

—"দেখ—দেখ, সমুদ্র ঠিক যেন আমায় গিলতে আসছে—কী ভয়ানক!"

—"সব কল্পনা, অনু। এখানে সমুদ্রতীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরে ভরা—ঢেউগুলো তারই উপর আছাড় খেয়ে অতটা লাফিয়ে উঠছে। আচ্ছা, চলো বাড়ি ফেরা যাক।"—

এম্‌নি এক সন্ধ্যার কন্‌কনে হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে অপর্ণার শরীরটা একটু খারাপ হয়! আমাদের ল্যাণ্ডলেডি ওকে বললে আগুনের ধারে চুপচাপ বসে থাকতে এবং আমাকে বারণ ক'রে দিলে আজ যেন ওকে বাইরে টেনে নিয়ে না যাই—সময়টা ভালো যাচ্ছে না, এই-রোদ-এই-মেঘ—যারা প্রকৃতিদেবীর এই খামখেয়ালিতে অভ্যস্ত নয়, তারা অসুখ-বিসুখ ক'রে বসতে পারে।

লাঞ্চ্‌-এর পর হঠাৎ বন্ধু সতীশ এসে হাজির। বললে—আমাকে ওর সঙ্গে একবার ব্রাইটনে যেতেই হবে—সেনের বাড়িতে! দরকারটা কি শুনে অপর্ণা বললে—"যাবে না? মানে? আমি মিসেস মা'রের সঙ্গে বেশ থাকবো, ভয় নেই—একটু বৈচিত্র্য দরকারও তোমার।"

—"আপনিও চলুন না অপর্ণা দি, ডাক্তার সেন কত খুসি-যে হবেন—! প্রায়ই আপনার কথা বলেন।"

অপর্ণা আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি বললাম—"না, কাজ নেই। তুমি আজকের দিনটা বিশ্রাম করো—"

সতীশ জিজ্ঞেস করল—"কেন, কি হয়েছে?"

—"একটু সর্দ্দি মতন হয়েছে কাল থেকে—"

—"ওঃ—কিছু এসে যাবে না ওতে—অমন একটুখানি সর্দ্দি—"

অপর্ণা একটু ভেবে বললে—"থাক্‌গে—আজকের দিনটা না-ই বেরুলাম। তুমি শীলাকে বোলো আমার কথা।

ডাক্তার সেন শীগ্‌গির আমাদের ছাড়লেন না। বিকেলের দিকে

বেরোতে যাব, এমন সময় বেশ খানিকটা বৃষ্টি হ'য়ে গেল, তাই সেন-জায়া ধ'রে বসলেন গরম গরম হালুয়া খেয়ে যেতে আর এক এক কাপ চা। বলা বাহুল্য, বিলেতে এমন স্বাদু প্রস্তাব ছেড়ে সহজে কেউ ঠাঁইনাড়া হতে চাইল না।

সবে আমাদের "বর্ষার" আসরটা জমে এসেছে এমন সময় বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল—মিনিটখানেক পরেই ঘরে এসে ঢুকল—অপর্ণা। জামা-জুতো ওর ভিজে শপ্ শপ্ করছে। ডাক্তার সেন তাড়াতাড়ি উঠে আগুনের ধারে একখানা চেয়ার টেনে এনে দিলেন, সেন-জায়া একজোড়া গরম বনাতের শ্লিপার এনে জুতো মোজা খুলে ফেলতে ব'লে শুধোলেন, শাড়ীখানা আর ব্লাউজটাও ছাড়বে কি না।

—"কিচ্ছু দরকার নেই শীলা, সিল্কের জিনিস—এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে সব। শুধু মোজাটা ছাড়া দরকার।" পরে আমার তিরস্কার-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে—"আমি মিছামিছি আসিনি, এই দেখ।" বলে একখানা টেলিগ্রাম দিল আমার হাতে। পড়ে দেখি, "হোম" থেকে এসেছে। ওরা লিখেছে, মিনুর ভারি অসুখ, আর একটা বেড়ালের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ভয়ানক কামড় খেয়েছে, পেছনে পায়ের কাছে খানিকটা চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে লাল দগ্‌দগে মাংস বেরিয়ে গেছে—বিনামেঘে বজ্র—বলে না?

অপর্ণা বললেন—"তুমি এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম ক'রে দেবে চলো, লিখে দাও যে, আমরা এলাম ব'লে এর মধ্যে ওরা যেন একটুও অযত্ন না করে।" তারপর শীলার দিকে ফিরে—"বেচারা কা কান্নাটাই কাঁদছিল খাঁচার মধ্যে ঢুকে। সখের কুকুর-বেড়ালকে কখনো ওসব হোম-টোমে পাঠাতে আছে? একটা-না-একটা গোল-মাল হবেই হবে।"

সেন-জায়া বললেন—"কিন্তু একটা বেড়ালের জন্যে একেবারে এখান থেকেই চ'লে যাবে, অপর্ণা? খরচ দিলে ওরাই তো ডাক্তার

ডেকে মিনুর দেখাশুনো করতে পারত—”

—“না ভাই, যাওয়াই ভালো। তা ছাড়া এখানে এত আগে থাকতেই যে-ঠাণ্ডা পড়তে সুরু হয়েছে—সমুদ্রের হাওয়াটাও এসময় ভালো নয়। যেতামই তো আর দিন-দুই পরে!—শরীরটাও আমার মোটেই ভালো ঠেকছে না।”

রাগত স্বরে বললাম—“তবু কেন হুড়মুড় ক'রে ঝড়ঝাপটায় ভিজতে ভিজতে এখানে এলে শুনি—এই খারাপ শরীরে? তুমি একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি।—মিসেস সেন, ওকে এক-জোড়া গরম মোজা এনে দিন তো। · চলো সতীশ, টেলিগ্রাফ-অফিসটা হ'য়ে বাড়ি।”

পথে যেতে যেতে সতীশ জিজ্ঞাসা করলে—“তাহলে কবে যাবেন আপনারা?”

অপর্ণা বললে—“কালই। আমার আর একটুও ভালো লাগছে না—”

আমি বললাম—“দেখছ সতীশ, একদিন এই বেড়ালই ছিল ওর চক্ষুশূল—”

হেসে বললে—“আপনারা বুঝবেন কী বলুন—অন্যের জুতোয় কোথায় উঠল পাহাড় প্রমাণ ছোট্ট পেরেক—” সতীশ এমনিভাবেই ইংরিজি প্রবচনকে তর্জ্জমা না ক'রে ছাড়বে না। ‘আই সি এস’-এর ছেলে স্বদেশী হয়েছে সবে—হবে না?

রাত্রে অপর্ণার বেশ একটু জ্বর হ'ল। তবু ও কিছুতেই আর দুদিনও থাকতে রাজি নয়—মিসেস মারে' কত ক'রে বললেন, কিন্তু ওর সেই এক দুঃস্বপ্ন—দেরি হ'লে মিনু যদি না বাঁচে?

ট্রেন থেকে নেমে আমাদের ফ্ল্যাটে যখন পৌছলাম, ততক্ষণে অপর্ণার সামান্য সর্দ্দি-জ্বর রীতিমত ইনফ্লুয়েঞ্জায় বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

বিপদের উপর বিপদ—সমস্ত সেপ্টেম্বরটা সমুদ্রতীরে কাটাব ভেবে জেসিকে এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছিল। এখন খোঁজ ক'রে দেখা গেল, সে গ্রামে কোন্ এক মেসোর বাড়িতে মাসখানেকের জন্যে বেড়াতে গেছে। অত অল্প সময়ের জন্যে অন্য মেড পাওয়া মুস্কিল। ওর মাকে বললাম চিঠি লিখে জেসিকে ঝটিতি আনাতে। ইতিমধ্যে সতীশ আর আমি নিজের হাতে সমস্ত কাজ করতে লাগলাম। দেখে অপর্ণা এক-এক সময় গোপনে উঠে নিজের দরকারি কাজগুলো নিজেই ক'রে রাখত। দুর্ব্বল শরীর আর সইবে কত ? দেখতে দেখতে ইনফ্লুয়েঞ্জা প্লুরিসিতে—প্লুরিসি নিউমোনিয়ায় দাঁড়াল।

বলতে ভুলে গেছি বাড়ি ফিরে অপর্ণার আর তর সয়নি—এসেই মিনুকে হোম থেকে আনিয়ে নেয়। পালিনীকে ফিরে পেয়ে মিনুর যা আনন্দ—! বেচারা এই কদিনেই কী রোগা হ'য়ে গেছে—! অপর্ণা গায়ে হাত বুলিয়ে ছল ছল চোখে বললে—"আহা, খেতে দেয়নি মোটে।—দেখেছ কী হালকা হয়ে গেছে ?"—যেন শোলা।

—"হ্যাঁ। কিন্তু দোষটা ওরই ; জিজ্ঞেস করেছিলাম গার্ডটাকে, সে বললে যে, মিনুই সারাদিন প্রায় কিছুই খেত না, ডাকলে সাড়া দিত না, মাছ দুধ যেমন তেমনি নাকি প'ড়ে থাকত।"

—"সত্যি ?—কেন ?"

—"জিজ্ঞেস করো না মিনিকেই—বুঝতে পারছ না ওর কাণ্ড দেখে ?"

অপর্ণা হাসল। বাস্তবিক, "হোম" থেকে এসে পর্য্যন্ত মিনু পারত-পক্ষে অপর্ণার বিছানা ছেড়ে কোথাও যায় না। অভ্যাসমত এক একবার বাইরে গিয়ে কাঠের বাক্সে মখমলের উপর ব'সে আবার সোজা ওরই ঘরে ফিরে আসে। ঢুকতে না দিলে বা দরজা খোলা না পেলে কাতরভাবে মি-মি করে, নয়তো দরজার কাছে চুপ ক'রে

ধর্ণা দিয়ে ব'সে থাকে। তবু আর কোথাও যেতে চায় না।
তারপর—যেদিন অপর্ণাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল—আঃ কিন্তু থাক্—থাক্ সে দিনগুলোর কথা—স্মৃতিও অতটা সইবে না, যদিও আজ আয়ুর অর্দ্ধেক এসেছে ফুরিয়ে।

চৌদ্দদিন পরে অপর্ণাকে চিরদিনের মত বিদায় ক'রে সতীশকে বললাম—"ভাই, আমি দিনকতক অন্য কোথাও ঘুরে আসি গে। এই নাও এ-চেক্‌খানা—ফ্ল্যাট্‌টা ছেড়ে দিও যত শীগ্‌গির পারো। আর, ভালো কথা—জেসিকেও একবার খবরটা দিও।"
—"কিন্তু এটার কী ব্যবস্থা করলি'রে সত্যেন?"
—"কার কথা বলছ?"
—"এই যে তোদের—মিনুর—"
—"ওঃ"—আমি চোখ সরিয়ে নিলাম—
—"কোরো যা হয়—"
ওরই জন্যে অনুর সামান্য সর্দ্দিকাশি প্লুরিসির দিকে মোড় নেয়—একটা সামান্য—উপলক্ষ্য—বেড়ালের জন্যে !!

অক্টোবরের মাঝামাঝি সেশন আরম্ভ। সেই ক্লাস, লাইব্রেরি, হাসপাতাল—গতানুগতিক দিনগতপাপক্ষয়! ধারও ধারে না সে মানুষের অন্তর্জগতে সুবৃহৎ পরিবর্ত্তনের—বহির্জগৎ সেই একইভাবে একটানা ব'য়ে চলেছে। আবার ছুটি নিয়ে চললাম দখিনমুখো। এখানকার আকাশে-বাতাসে ওর স্মৃতি মাখানো—অসম্ভব, অসম্ভব এখন এখানে থাকা।—
যাবার আগে কি জানি কেন—হঠাৎ মনে হ'ল—একবার মিনিকে দেখে যাই। সতীশ ওর বাড়িতে নিয়ে রেখে দিয়েছে। ওর ল্যাণ্ডলেডি এসে বললে—"বড়লক্ষ্মী বেড়াল, আর এ—ত সুন্দর!

আমার ছেলেমেয়েরা ভারি ভালোবাসে, কিন্তু দুঃখের বিষয় মিষ্টার রায়, মিনু যে আপনার কিছুই খেতে চায় না!—আদর ক'রে ডাকলেওসাড়া দেয় না—কেমন যেন মনমরা হ'য়ে থাকে। দেখবেন একবার আপনি?"

ওর পেছন পেছন রান্নাঘরে গিয়ে দেখি মিনু জানলার উপর চুপ ক'রে ব'সে। ভালো যে লাগছে না ওর, দেখলেই বোঝা যায়।

—"মিসেস রীড, আমি এক্ষুনি আবার আসছি।" ব'লে বেরিয়ে গেলাম: কাছেই এক মাংসের দোকানে গিয়ে দু'পেনির কিমা-করা মাংস কিনে এনে মিনুকে নিয়ে এলাম সতীশের বসবার ঘরে। সামনে ধ'রে দিয়ে সোফায় ব'সে ওর খাওয়া দেখতে লাগলাম। মিনু দু-একবার মাংস শুঁকে দেখে আমার কাছে এসে পায়ের ওপর গা-মাথা ঘষতে লাগল। চিনেছে ও। একটু আদর ক'রে পিঠ চাপড়ে বললাম—"খা না মিনি!"

ফিরে আসবার সময় মিনু দোর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল। মিসেস রীডকে ডেকে বললাম নিয়ে গিয়ে দোরটা বন্ধ ক'রে দিতে।

—"কিন্তু না খেয়ে আপনার বেড়াল যদি মারা যায় মিষ্টার রায়? আমরা যে কোনোমতেই বাগ মানাতে পারছি নি ওকে।"

আমি জবাব দেবার আগেই সতীশ বললে—"আচ্ছা, সে আমিই দেখব'খন, মিসেস রীড"—

সমস্ত শীতটা দক্ষিণে কাটিয়ে বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলাম সেই পুরোণো সহরে। নতুন বাড়িতে দুটো ঘর নিয়ে গুছিয়ে ব'সেই মনে পড়ল মিনুর কথা। দেখতে হচ্ছে একবার—এতদিন বেঁচে আছে কি নেই—যা মনমরা হ'য়ে থাকতে দেখেছি মাস কয়েক আগে।

সতীশ সে বাড়ি থেকে উঠে গেছে আমি দক্ষিণ-দেশে থাকতেই।

মিসেস রীডের খুকি পলি এসে দরজা খুলে দিল।

—"মা কোথায় এ্যান ? ডেকে দাও তো—"

—"মিষ্টার রায় ! আপনি ?—আছেন ভালো ?"

—"মিনুকে দেখতে এসেছি মিসেস রীড—আছে তো সে ?"

—"আছে ব'লে আছে ?—আসুন আসুন"—আমাদের ঘরে বসিয়ে "এমন চমৎকার বেড়ালকে কি আমি হাতছাড়া করতে পারি ? ও-ই যে দেখুন না—ও-ই বাইরে রান্নাঘরের বাগানের দেয়ালে ধ্যানস্থ। কত বড়টি হয়েছে দেখেছেন ? আজকাল বাড়িতে ঢুকতেই চায় না—সঙ্গিনী জুটেছে কিনা ! মিনু এখন মস্ত লোক, পাড়ার বেড়ালদের সর্দ্দার-গোছের !"

একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখে চলে এলাম।

হায় অপর্ণা, এই তো জগতের ভালোবাসা !—তোমার অভাবের দুঃখ স'য়েও আমাদের প্রাণের ধারা তেমনি টেনে চলেছে আপন স্রোতের জের !

রায়বাড়ি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সামান্য একটুকরা কাগজ, কোন ক্রিয়াকর্ম্মের ফর্দ্দের ছিন্নাংশ। সুধাংশুর বাড়ী হইতে কাগজখানা পাওয়া গেল। বহুজনের অনু-রোধে অতি-মিতব্যয়ী সুধাংশু তাহার মেটে-ঘরের মেঝে বাঁধাইতে রাজী হইল। ইঁট চুন সিমেণ্ট সব আসিয়া উপস্থিত হইলে ঘরের বাক্স পেঁটরা জিনিসপত্র বাহির করিতে সুধাংশুর বৃদ্ধা পিতামহীর একটা সে-আমলের বেতের পেঁটরা হইতে ঐ কাগজখানা বাহির হইয়া পড়িল। কাগজখানা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল সকলেরই।

পুরাণো আমলের মোটা কাগজে ছাপান ফর্দ্দ, ফর্দ্দখানার উপরের অংশ নাই—নীচের অংশটায় যেন সিন্দুর মোড়া ছিল বলিয়া মনে হয়। ফর্দ্দখানায় লম্বাভাবে জিনিসপত্রের নাম দুই সারিতে ছাপান, জিনিসের নামের পাশে পরিমাণের অঙ্ক হাতে লেখা। প্রথম সারিতে ২২ দফা হইতে ৩৭ দফা দ্রব্যের নাম শেষ হইয়াছে ; উপরের ২১ দফা জিনিসের নাম ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; দ্বিতীয় সারিতে ৫৭ দফা হইতে ৬৪ দফা পর্য্যন্ত জিনিষের নাম পাওয়া যায়।

ফর্দ্দখানা এইরূপ—

২২। সৈন্ধব লবণ ১ ছটাক
২৩। করকচ লবণ ৩ পোয়া
২৪। সর্ষপ তৈল ১ সের
২৫। কাটা সুপারী-আধ পোয়া
২৬। খদির ১গুটী
২৭। পান মশলা ১ দফা

৫৭। মোটা তামাক ১ দফা
৫৮। মিহি তামাক ১ দফা
৫৯। টিকে ১ দফা
৬০। খড়কে ১ „
৬১। কোশাকুশী ১ „
৬২। গঙ্গাজল ১ „
৬৩। কুশাসন ১ „
৬৪। গঙ্গা-মৃত্তিকা ১ „

ইত্যাদি। ফুল-বিল্বপত্র, যব, তিল, হোমের ঘৃত, হোম কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিষটির নাম তাহাতে আছে। সকলে অনুমান করিল কোন সমারোহের ক্রিয়া কর্ম্মে—বোধ হয় কোন শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে দিবার সিধার ফর্দ্দের নিম্নাংশ এটি। অনুমান সত্য—সুধাংশুর পিতামহী আজও জীবিতা—তিনিই এ ইতিহাস আমাকে বলিলেন।

১২৭০ সাল—ইং ১৮৬৩ সালের ঘটনা। সিপাহী যুদ্ধ সবে শেষ হইয়াছে—অগ্নি নিভিয়াছে কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ তখনও সম্পূর্ণরূপে বিকীরিত হয় নাই। দেশের লোকের অসি গিয়াছে—কিন্তু বাঁশের লাঠি তখনও বাঁশীতে পরিণত হয় নাই। তখন লোকে বাবরী চুল রাখিত কিন্তু বব ছাঁটে নাই। জমিদার তখনও ভূস্বামী এবং তাঁহাদের সে স্বামীত্বের সত্যকার অর্থ তাঁহারা বজায় রাখিয়াছিলেন।

রাজারামপুরের রায়-বাড়ীর তখন অসীম প্রতাপ। এখনও একটা কথা প্রচলিত আছে—রায়-বাড়ীর রাজ্যের মধ্যে বাঘে বলদে এক-ঘাটে জলপান করিত, দুর্দ্দান্ত বাঘকেও নাকি হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রায় বংশের চতুর্থ পুরুষ রাবণেশ্বর রায় তখন রায়-বাড়ীর একক উত্তরাধিকারী। ১০৯২ নম্বর লাট হুদ্দা শ্যাম-পুরের মাতব্বর প্রজারা আসিয়া সদরে কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল, হুজুর রক্ষা করুন।

হুদ্দা শ্যামপুর দুর্দ্দান্ত মুসলমান, বাগ্দী ও হাড়ি লাঠিয়ালের বাস এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন অধিবাসীরা কূট-কৌশলী, পাকা ষড়যন্ত্রী। আজ দুই পুরুষ তাহারা বিনা খাজনায় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, পঞ্চাশ বৎসর কোন জমিদার এখানে পুণ্যাহ করিতে পারেন নাই। চার পাঁচ ঘর জমিদারের হাত-ফের হইয়া অবশেষে

হুদ্দা শ্যামপুর রাবণেশ্বর রায়ের হাতে আসিল। শেষ জমিদার আক্রোশভরে রাবণেশ্বর রায়কে ডাকিয়া পত্তনী বিলি করিলেন। রায় তাঁহার ইষ্টদেবী কালীমাতার সেবাইত স্বরূপে সম্পত্তি পত্তনী গ্রহণ করিলেন। আজ পূর্ণ একবৎসর বিরোধ চালাইয়া বোধ হয় ক্লান্ত হইয়াই প্রজারা আসিয়া রায় দরবারে গড়াইয়া পড়িল।

প্রজারা সংখ্যায় ছিল চল্লিশ জন। লাট শ্যামপুরের মধ্যে গ্রামের সংখ্যা ছত্রিশখানি, ছত্রিশখানি গ্রামের ছত্রিশজন মণ্ডল প্রজা আসিয়াছিল; তাহার উপর সঙ্গে ছিল শ্যামপুরের কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জোতদার রাধানাথ দাস, আর ছিল ঘাঁটীতোড় গ্রামের মুসলমান প্রজাদের মুখপাত্র ওবেদার রহমন ও তিনু মিয়া। বেলা তখন অপরাহ্ণেরও শেষ ভাগ, সন্ধ্যা হইতে বিশেষ বিলম্ব ছিল না। রায় সরকারের কাছারী তখন আবার দ্বিতীয় দফায় আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে তকমা-আঁটা হরকরা চাপরাশীদের যাওয়া আসার বিরাম নাই, লোকজনে কাছারী গিস্‌গিস্‌ করিতেছে। শ্যামপুরের প্রজারা ইহার পূর্ব্বে কয়েক ঘর জমিদারের সহিত বিবাদ করিয়াছে এবং তাহাদের ঘায়েল করিয়াছে সত্য কিন্তু তাঁহারা ছিলেন মধ্যশ্রেণীর জমিদার, এত বড় জমিদার শ্যামপুরের প্রজারা দেখে নাই। কাছারীর পরিধি ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল।

কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত রসিক লোক, সে উঁকি মারিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনাবশ্যকভাবে কাছাটা আর একটু সাঁটিয়া বলিল—

কাছারীই বটে রে বাবা, কাছার অরি! কিন্তু হুজুর কই? শ্যামপুরের নির্দ্দিষ্ট গমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী হাসিয়া বলিল, হুজুর বসেন দোতালায়। সকলের দৃষ্টি আপনা হইতেই উপরে দোতালার জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল। সুদীর্ঘ অট্টালিকার দ্বিতলে সারি সারি জানালা, প্রজারা সভয় বিস্ময়ে প্রত্যেক জানালার দিকে চাহিয়া তাহাদের

কল্পনার মানুষটীকে খুঁজিতেছিল।

গমস্তা বলিল, এ দোতালায় হ'ল সব নায়েব সেরেস্তা, নায়েব বাবুরা বসেন এখানে। হুজুরের কাছারী এখান থেকে দেখা যায় না, ওপাশে ফুলবাগানের সামনে—।

ঠিক এই সময় একজন হরকরা আসিয়া কথায় বাধা দিল—গমস্তাকে বলিল, নায়েব বাবু ডাকছেন আপনাকে।

গমস্তা চলিয়া গেল।

গুপ্ত হাসিয়া বলিল, দাসজী. দেশে বর্গী এসেছে, দুষ্ট ছেলেদের ঘুমপাড়াও। গোলমাল করলেই বিপদ!

রাধানাথ দাস চিন্তাকুলমুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাই দেখছি।

গুপ্ত এবার ওবেদার রহমনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল. তোবা তোবা বল চাচা, মুখে যে মাছি ঢুকছে! বলি হাঁ ক'রে দেখছ কি?

পিছন হইতে রতন মণ্ডল বলিল, বাহারের লক্সা কেটেছে কিন্তু দালানে—গুপ্তমশায়!

অপর একজন বলিয়া উঠিল, এ যে গোলকধাঁধারে বাপু, ইদিকে দালান, উ-দিকে দালান—আড়ে দীঘে ওর নাইরে বাবা—হ-হ!

—আসুন, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

একজন সরকার আসিয়া তাহাদের সকলকে আহ্বান করিল।

গুপ্ত বলিল, আমাদিগে বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের ভার আমার ওপর. আমি কালীমায়ের দেবোত্তরের সরকার। সরকার অগ্রসর হইল।

গুপ্ত কৃত্রিম ভয়ে বিহ্বলতার ভাণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল. ও দাসজী, কোথায় নিয়ে যাবে হে বাপু! গারদে না একেবারে—।

বিরক্তিভরে বাধা দিয়া রাধানাথ দাস কহিল, চুপ কর গুপ্ত, সব সময়েই তোমার ইয়ে, হ্যাঁ!

ওবেদার রহমন হাসিয়া বলিল, ভয় কি চাচা, আমাদের বাড়ীও

ঘঁাটীতোড়, লাঠীর ডগায় ঘঁাটী তোড়াই হ'ল আমাদের ব্যবসা। ভয় কি—ঘঁাটী ভেঙে তোমাকে পিঠে করে নিয়ে পালাব।

কাছারী পার হইয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দির—তাহার পর জগদ্ধাত্রীর বাড়ী, তাহার পর একেবারে গঙ্গার কূলের উপরেই রায়চৌধুরীদের কালী-বাড়ী। গঙ্গা যখন কূলে কূলে পাথার হইয়া ওঠে তখন কালী-বাড়ীর বাঁধা ঘাটের প্রশস্ত চত্বরের গায়ে গঙ্গার জল ছলছল করিয়া আঘাত করে। ভিতরে দক্ষিণমুখী মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ সুউচ্চ নাটমন্দির ; নাটমন্দিরকে পরিবেষ্টন করিয়া তিন দিকে খিলানের বারান্দাযুক্ত সারি সারি একতলা ঘর। দক্ষিণ দিকের বারান্দার কোলে পাশাপাশি দুইখানা ঘরের দরজা খোলা ছিল, খোলা দরজা দিয়া দেখা যাইতেছিল ঘরের সতরঞ্চির উপর সাদা চাদর ধপ্ ধপ্ করিতেছে, একদিকে সারি সারি বালিশ পড়িয়া আছে। ঘরের দরজার সম্মুখেই প্রকাণ্ড দুইটা জালায় জল ও বড় বড় ঘটী রাখিয়া দুইজন চাকর অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।
সরকার বলিল—এইখানে আপনারা বিশ্রাম করুন। মুসলমান যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্য ওপাশে ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরে জিনিষপত্র রেখে দিন।
আগন্তকদের কেহ কোন উত্তর দিল না, সকলে সবিস্ময়ে দেখিতেছিল ঠাকুরবাড়ী। হাত মুখ ধুইয়া নাটমন্দিরে উঠিয়া তাহাদের বিস্ময় বিপুল হইয়া উঠিল—শুধু বিস্ময় নয়—শ্যামপুরের দুর্দ্দান্ত অধিবাসী-দলের শরীর কেমন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরের অসাধারণ উচ্চতা সত্যই মানুষকে কেমন অভিভূত করিয়া ফেলে। তাহার উপর এতবড় নাটমন্দিরটার অভ্যন্তর ভাগ তখন আধ-আলো আধ-ছায়ায় যেন থম থম করিতেছিল। চোখের সম্মুখের অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটিয়া পরিবেষ্টনীর সম্পূর্ণ রূপ তাহাদের

দৃষ্টিতে ধরা দিতেই তাহারা সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নাটমন্দিরের চারিপাশে থামের গায়ে নানা আকারের বলির খড়্গ আলোকের অভাবে প্রভাহীন শানিত রূপ লইয়া ঝুলিতেছিল। মন্দিরের ঠিক সম্মুখেই দক্ষিণে বামে সুবৃহৎ দুই যূপকাষ্ঠ।

দেবীমন্দিরের দ্বার তখন রুদ্ধ ছিল। রুদ্ধদ্বারের সম্মুখেই প্রণাম সারিয়া তাহারা আসিয়া বসার ঘরে আশ্রয় লইল। দুর্দ্দান্ত ভয়ে ও আকুল চিন্তায় আচ্ছন্ন নির্ব্বাক হইয়া সব বসিয়া রহিল।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাধানাথ দাস বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল, কে রে বাপু, ফোঁস্-ফোঁস্ করছিস কে?

কেহ উত্তর দিল না। এই সময় একজন চাকর আলো লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, সেই আলোয় দেখা গেল, এক কোণে বালিশে মুখ গুঁজিয়া প্রৌঢ় বিপিন মোড়ল ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিতেছে। দাস দাঁত কিস্ কিস্ করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই চাকরটা বলিয়া উঠিল, হুজুর আসছেন! বলিতে বলিতেই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ঘরের ছাদের উপর রাবণেশ্বর রায়ের খড়মের শব্দ খট্ খট্ করিয়া কঠোর শব্দে বাজিতেছিল, সমস্ত ছাদটা সঞ্চারিত করিয়া একটা কম্পন অনুভূত হইতেছিল।

দাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, ওঠ্, ওঠ্, সব নজরের টাকা বার কর! গুপ্ত, গুপ্ত—সেখজীদের সব ডাক হে! আঃ সব মাটী করলে!

বাহিরে নাটমন্দিরে তখন দেওয়াল-গিরিতে ঝাড় লণ্ঠনে সারি সারি বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রজারা সকলে সারি দিয়া নাটমন্দিরে উঠবার সিঁড়ির মুখে রায়-হুজুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

রাবণেশ্বর রায় নামিতেছিলেন দোতালার সিঁড়ি বাহিয়া। নাটমন্দিরের আলোক-মালার ছটার প্রাচুর্য্যে প্রজারা তাঁহাকে সভয় বিস্ময়ে

দেখিল। দীর্ঘাকার পুরুষ খড়্গের মত তীক্ষ্ণ দীর্ঘ নাসিকা, আয়ত চোখ, সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে স্থূলতার এতটুকু চিহ্ন নাই, কিন্তু সিংহের মত বলিষ্ঠ দেহ—প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটী! বয়স প্রায় চল্লিশ। পরিচ্ছদ ও ভূষণের মধ্যে পরণে গরদের কাপড়, কাঁধে নামাবলী, অনাবৃত বক্ষে শুভ্র উপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা, দক্ষিণ বাহুতে সোনার তাগায় একটী মোটা রুদ্রাক্ষ, হাতের অনামিকায় নবরত্নের একটী আংটী।

হিন্দু প্রজারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, মুসলমান প্রজারা আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছিল নজরের টাকার।

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথাকার প্রজা?

কর্ত্তার পিছনে ছিল দেবোত্তরের নায়েব, সে উত্তর দিল, আজ্ঞে হুদ্দা শ্যামপুর, কালীমায়ের নতুন মহাল।

—হুদ্দা শ্যামপুর?

রাবণেশ্বর রায় ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাঁহার কাঁধের নামাবলীখানা স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। নায়েব তাড়াতাড়ি সেখানা উঠাইয়া লইল। রায় গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—তারা—তারা!

তারপর ভ্রূক্ষেপহীন পদক্ষেপে নাটমন্দিরের উপরে উঠিয়া গেলেন, সে পদক্ষেপের তাড়নায় নজরের টাকাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নায়েব দেখিয়া শুনিয়া নজরের টাকাগুলি গুণিয়া গাঁথিয়া তুলিয়া লইলেন। ওদিকে তখন দেবী-মন্দিরের দ্বার খোলা হইয়াছে—প্রকাণ্ড কাঁসরখানায় ঘন্ ঘন্ শব্দে ঘা পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-কাঁসি-শিঙা বাজিতেছিল। পবিত্র ষোড়শাঙ্গ ধূপের গন্ধে নাটমন্দির আমোদিত।

আরতি শেষ হইতেই প্রজারা নীরবে প্রণাম সারিয়া আবার আসিয়া ঘরে আশ্রয় লইল। সরকার আসিয়া আহ্বান করিল, আসুন—

আপনারা মায়ের শীতলের প্রসাদ নিয়ে জল খাবেন আসুন।
নাটমন্দির হইতে ডাক আসিল, সরকার !
একজন খানসামাকে ও দেবীমন্দিরের পরিচারককে জলযোগের ব্যবস্থায় নিযুক্ত করিয়া সরকার তাড়াতাড়ি কর্তার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় বসিয়া জলযোগ করিতে করিতেই প্রজারা শুনিল কর্তা প্রশ্ন করিতেছেন—প্রজারা কতজন এসেছেন ?
—আজ্ঞে চল্লিশ জন।
—খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে ?
—আজ্ঞে হ্যাঁ।
—মাছ ?
—আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে।
—কত ?
—আজ্ঞে দশ সের।
—হুঁ—দুধ ?
সরকার এবার চুপ করিয়া রহিল। কর্তা আবার প্রশ্ন করিলেন—দুধের ব্যবস্থা হয়েছে ?
—আজ্ঞে—অবেলায়। সরকার আর উচ্চারণ করিতে পারিল না।
কর্তা বলিলেন, অতিথি—তিথি মেনে আসে না, বেলা দেখে আসে না। যাও—বাড়ীর দুধ নিয়ে এস।
সরকার যেন বাঁচিল—সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল। কর্তা আবার বলিলেন, গিন্নীর কাছে খবর নাও, লক্ষ্মী-নারায়ণজীর দরবারে মা জগদ্ধাত্রীর দরবারে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা !
সরকার চলিয়া গেল। রায়কর্তা জপমালা লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন—তন্ত্রমতে সন্ধ্যা তর্পণ জপ করিবেন।
নিস্তব্ধ নাটমন্দির। পরিচারক পূজারীর দল নিস্তব্ধভাবেই আনা-গোনা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে মন্দির অভ্যন্তর হইতে মোটা ভরাট

গলায় রায়কর্ত্তা ডাকিতেছিলেন—তারা—তারা!
সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটী অকৃত্রিম আবেগ রণ্ রণ্ করিয়া বাজিতেছিল।

অনেকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সরকার ও শ্যামপুরের গমস্তা ঠাকুর-দাস চক্রবর্ত্তী আসিয়া ডাকিল, উঠুন সব, খাবারের ঠাঁই হয়েছে।
গুপ্ত নিজে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, মরেছে রে—বেটা চাষারা সব মরেছে। নরম বালিশ মাথায় দিয়েছে কি মরণ ঘুমে—
গমস্তা চক্রবর্ত্তী মৃদুস্বরে বলিল, চুপ, চুপ—বাইরে হুজুর আছেন।
প্রজারা বাহিরে আসিয়া দেখিল, রায়কর্ত্তা নিজে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরণে এখন কোঁচান মিহি থান ধুতি—গায়ে গিলা করা পাঞ্জাবী—পায়ে চটী। সকলে মাথা হেঁট করিয়া খাইতে বসিল।
কর্ত্তা বলিলেন, কি হে—হুদ্দা শ্যামপুরের সব বড় বড় বীরের কথা শুনেছি। কিন্তু কই আহার কই সব? খাচ্ছ কই তোমরা?
কর্ত্তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়িত, কিন্তু একটী অনাবিল প্রসন্নতায় হৃদ্য।
গুপ্ত অভয় পাইয়া বলিল—আজ্ঞে হুজুর—মা-লক্ষ্মী বড় কাহিল ঠেকছেন, আমরা ভাল খেতে পারছি না হুজুর!
কর্ত্তা বলিলেন—ভেঙে বল ত' বাপু—কি হয়েছে!
—আজ্ঞে এই সরুচালের অন্ন আমাদের কেমন জল জল লাগছে। এই মোটা আকাঁড়া চালের ভাত ভিন্ন আমাদের মিষ্টি লাগে না হুজুর!
কর্ত্তা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তারপর হুকুম করিলেন, ঠাকুর মোটা চালের ভাত নিয়ে এস।
সুযোগ বুঝিয়া রাধাচরণ দাস বলিয়া উঠিল—হুজুর যদি অভয় দেন ত একটী নিবেদন পাই!
হৃদ্য কণ্ঠস্বরে কর্ত্তা বলিলেন—বল, বল!

—হুজুর রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ হ'ল বাপ আর বেটা।

কর্ত্তার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল—বলিলেন—শুনে ত আসছি তাই চিরকাল। কিন্তু বেটায় এত বাপ বদল করে কেন হে? পছন্দ হয় না?

রাধাচরণের মাথা হেঁট হইয়া গেল। সকলের আহার শেষ হইলে সমস্ত ঠাকুরবাড়ীগুলি ঘুরিয়া রায়কর্ত্তা দ্বিতলে উঠিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রজাদের কাছারীতে তলব হইল। মিটমাটের কথা-বার্ত্তা সমস্ত সুশেষ করিয়া প্রজারা বিদায় লইল। প্রত্যেকের মিলিল ধুতি ও চাদর এবং ফিরিবার গাড়ীভাড়া প্রত্যেককে দেওয়া হইল। গুপ্তকে চিকিৎসক জানিয়া সম্মানী স্বরূপ পাঁচ বিঘা নিষ্কর ভূমির সনন্দ রায়কর্ত্তা সহি করিয়া দিলেন।

মাস খানেক পর।

রাবণেশ্বর রায় আহারান্তে দ্বিপ্রহরে অন্দরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। রায়গিন্নী পাশে বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছিলেন। ঝি আসিয়া খবর দিল, কোন গমস্তার পরিবার এসেছে—খুব কান্নাকাটী করছে।

কর্ত্তা উঠিয়া বসিলেন—বলিলেন—উঠে যাও গিন্নী, দেখ—কার কি হ'ল!

রায়-গিন্নী উঠিয়া গিয়া একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকটীর কাপড়খানা জীর্ণ নয় কিন্তু কাদায় ধুলায় মালিন্যের আর তাহাতে শেষ নাই, তাহার কোলে একটী শিশু।

শিশুটীকে রায়কর্ত্তার পায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া মেয়েটী মূর্তিমতী বিষণ্ণতার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

গিন্নী সজল চক্ষে কহিলেন—হুদ্দাশ্যামপুরের গমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী। মেয়েটি এবার হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কর্ত্তার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কর্ত্তা শশব্যস্তে বলিলেন,

ওঠ মা, ওঠ—কি হয়েছে বল।

গিন্নি বলিলেন, প্রজারা চক্রবর্ত্তীকে পুড়িয়ে মেরেছে। নগ্দী কোন রকমে এদের নিয়ে এখানে এসে—।

রায়-গিন্নীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দরদরধারে চোখের জলে বক্ষবাস সিক্ত হইয়া উঠিল।

কর্ত্তা গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, যুগ্লা!

যুগল খানসামা দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা বলিলেন, দেখ, কাছারীতে কোথায় হুদ্দাশ্যামপুরের নগ্দী এসেছে—তাকে নিয়ে আয়।

সবিস্ময়ে যুগল প্রশ্ন করিল—এখানে?

কর্ত্তা যুগলার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন শুধু। যুগ্লা আর উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না, দ্রুত পদে চলিয়া গেল। কর্ত্তা ধীর-পদক্ষেপে কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে বলিলেন, মৃত্যুর ওপরে হাত নাই মা, কি করব বল! তবে নিশ্চিন্ত থাক তুমি, আমার ছেলে বিশ্বেশ্বর যদি খেতে পায়—তা'হলেতোমার ছেলেও পাবে। যাও গিন্নী, ওঁকে স্নান করিয়ে কিছু খেতে দাও। যাও মা, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও।

মেয়েটী ধীরে ধীরে গিন্নীর সহিত চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই যুগ্লা নগ্দীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে যাহা বলিল তাহা এই—প্রজারা এখানে মৌখিক মিটমাটের কথা শেষ করিয়া গেলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছিল। হুজুর নাকি এখানে তাহাদের বাপ তুলিয়া কি গালিগালাজ দিয়াছিলেন। জমিদারপক্ষীয় কেহ কিন্তু তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারে নাই। ঘটনার দিন গমস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া গুড় তৈয়ারী করা উনানের মধ্যে পুড়াইয়া মারিয়াছে। সঙ্গের চাপরাসী দুইজনও জখম হইয়া এখনও সেখানে

যে কি অবস্থায় আছে তাহা বলিতে পারে না। তাহার পরই উন্মত্ত প্রজারা আসিয়া কাছারী ঘরে আগুন দেয়। নগদী কোন রকমে গমস্তার স্ত্রী পুত্রকে লইয়া সদরে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

রায়-কর্ত্তা একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হুঁ।

তারপর পাশের ঘরে গিয়া ঘুমন্ত একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বরের হাত খুলিয়া লইয়া নগদীর হাতে দিয়া বলিলেন—নিয়ে যা। যুগ্‌লা—গিন্নীর কাছে একে নিয়ে যা, বলবি বিশ্বেশ্বর যা খায় তাই যেন একে খেতে দেওয়া হয়। নিজে পাশে ব'সে যেন তিনি খাওয়ান। আর কেলে বাগ্দীকে ডেকে নিয়ে আয়—এখুনি—এইখানে।

কিছুক্ষণ পরে যুগলার পিছন পিছন দীর্ঘ শীর্ণ প্রেতের মত এক মূর্ত্তি অন্দরে একেবারে কর্ত্তার শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদক্ষেপে গিয়া প্রবেশ করিল। কালী বাগ্দীর পদশব্দ নাকি বিড়াল কি বাঘের মত শোনা যায় না। কিন্তু কালী বাগ্দীর অন্দর প্রবেশে অন্দর-বাসিনীরা সচকিত হইয়া উঠিল। এ ব্যবস্থা অভিনব, রায় অন্দরে খানসামা কদাচিৎ নায়েব ব্যতীত অপর কেহ কখনও প্রবেশ করে নাই। অন্দরের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন গুঞ্জিত হইয়া উঠিল।

রায়-গিন্নী কথাটা শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন কালী বাগ্দীর পরিচয় তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ মুখেই তিনি শুনিলেন, রায়-কর্ত্তা বলিতেছেন, ছত্রিশ মৌজা কালো ক'রে দিয়ে আসতে হবে। এক-খানা চালা বাঁচলে তোর মাথা বাঁচবে না, বুঝলি। কেউ যেন এক ফোঁটা জল আগুনে দিতে না পারে।

কালী অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলিল, এই বেলাতেই বেরিয়ে পড়ছি আমরা।

রায়-গিন্নী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—না—তা হবে না, আমি হতে দোব না।

কর্ত্তা বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—কি হবে না ?

—গ্রাম পোড়াতে আমি দোব না। প্রজাশাসন—

রায়-কর্ত্তা বাধা দিয়ে বলিলেন, যা বোঝ না গিন্নী—সে বিষয়ে হাত দিতে যেয়ো না।

গিন্নী এবার বলিলেন—কালী তুই যদি যাবি—।

কালীর দিকে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন—কই কালী ? কালী কখন নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে !

গিন্নী বলিলেন—ফিরিয়ে আন—ডাক ওকে।

—গিন্নী, মাটী বাপের নয়—মাটী দাপের। শ্যামপুরের প্রজা আমার মাথায় পা দিয়েছে।

—কেন—আমার বাবাও জমিদারী শাসন করেন—, হাসিয়া রায়-কর্ত্তা বলিলেন—বৈষ্ণবী মতে। কিন্তু আমরা শাক্ত গিন্নী—তোমার বাপেদের সঙ্গে আমাদের মতে মিলবে না। দেখলে ত সেপাই-হাঙ্গামা—কোম্পানী কেমন করে শাসন করলে।

রায় গিন্নীর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল—বলিলেন, দেখ প্রজা না হয় দোষ ক'রেছে—কিন্তু তাদের স্ত্রী পুত্র—

রায়-কর্ত্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন—অসময়েই আজ অন্দর হইতে বাহির হইয়া কাছারীতে চলিয়া গেলেন।

দিন পাঁচেক পর, রায়-কর্ত্তা কালী-মন্দিরে সন্ধ্যা-তর্পণ করিয়া নাট-মন্দির হইতে নীচে নামিতেছেন, এমন সময় নাটমন্দিরের থামের সুদীর্ঘ ছায়া যেন কায়া গ্রহণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছায়ার সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়াছিল কালী বাগ্দী—সে আসিয়া প্রণাম করিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—কালী ?

শান্ত মৃদুস্বরে কালী কহিল—কাজ হ'য়ে গিয়েছে হুজুর।

কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—তারা ! তারা !

কালা বাগ্দী প্রমুখ কয়েকজনকে সেখানে রাখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আগামী কল্য রথযাত্রার দিন রায়-বাড়ীর সদর পুণ্যাহ হইবে। এই দিনটী পুণ্যাহের জন্য বরাবর নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। পুণ্যাহের দিন দান-ধ্যান—কাঙালী ভোজন, নাচগান, জলসা ইত্যাদি সমারোহের বিপুল আয়োজন হইতেছে। সমস্ত রায়-বাড়ীর এই সময় রং ফিরান হইয়া থাকে। লতায় পাতায় ঠাকুরবাড়ী সাজান হইতেছে কয়েক জন বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ ও যন্ত্রী আসিয়াছেন, সন্ধ্যায় জলসাঘরে জলসা হইবে।

আজ ব্রজরাণী ও বিশ্বেশ্বর ফিরিবেন। আগামী কল্য রায়-গিন্নী উপস্থিত না থাকিলেই নয়। রায়-কর্ত্তা কালীবাড়ী হইতে পুণ্যাহের রৌপ্য-কলস মাথায় করিয়া রাধাগোবিন্দজীর দরবারে আনিয়া স্থাপন করিবেন, গোবিন্দ মন্দিরে সে কলসী কাঁখে তুলিবেন রায়-গিন্নী। অন্দরে লক্ষ্মীর সিংহাসনে লইয়া গিয়া সে কলসী তিনি স্থাপন করিবেন—রাত্রে লক্ষ্মীপূজা করিবেন।

রায় সরকারের ভূ-সম্পত্তি বহু-বিস্তৃত, সারা বাংলাময়ই ছড়াইয়া আছে। প্রত্যেক মৌজায় নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়াছে, পুণ্যাহপাত্র মণ্ডল প্রজারা সব—পুণ্যাহের টাকা লইয়া উপস্থিত হইবে। হুদ্দা-শ্যামপুরেও নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান হইয়াছে—কিন্তু এখনও কেহ উপস্থিত হয় নাই।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বে নায়েব আসিয়া বলিল—কই গিন্নীমায়ের বজ্‌রা ত এখনও এসে পৌঁছুল না!

রায়-কর্ত্তা একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সময় এখনও যায় নি। কিন্তু হুদ্দা-শ্যামপুরের—। কথা শেষ না করিয়া তিনি নীরব হইলেন।

নায়েব বলিল—কই, এখনও ত কেউ আসে নি।

এ কথার কোন জবাব না দিয়া কর্ত্তা বলিলেন, জলসাঘরে বাতি বল, আসর বসবে।

নায়েব বলিল—যে আজ্ঞে। তারপর আবার বলিল, গিন্নীমায়ের বজরা দেখবার ছিপ দু'খানা—আজকাল ভরা নদী—;

সচকিত হইয়া কর্ত্তা বলিলেন—দাও—পাঠিয়ে দাও!

জলসা-ঘরে মজলিস চলিতেছিল। প্রকাণ্ড বড় একখানি হল-ঘর; এক শত লোকের স্বচ্ছন্দে স্থান সংস্থান হইতে পারে; একদিকে বড় বড় জানালা ও বারান্দার দিকে বড় বড় দরজা। সেই ঘরের মেঝে জুড়িয়া বহুমূল্য গালিচা পাতিয়া তাহার উপর আসর বসিয়াছে। দেওয়াল ঘেঁসিয়া বড় বড় তাকিয়া দেওয়া আছে। মাথার উপরে সারি সারি বেলোয়ারী ঝাড় ও দেওয়ালে দেওয়াল-গিরির বাতির আলোয় সমস্ত ঘরখানা ঝলমল করিতেছিল। আতর গোলাপ-জলের গন্ধে ঘর আমোদিত। বারান্দার উপর দরজার মুখে মুখে দাঁড়াইয়া চাকরেরা বড় বড় তাল পাখার মৃদু আন্দোলনে ঘরে বায়ু প্রবাহ সঞ্চারিত করিতেছে। শ্রোতার দল নিস্তব্ধ, বাহিরে পরিচারকের দল সন্তর্পিত পদক্ষেপে মূকের মত চলা-ফেরা করিতেছে। একজন সেতারী সেতার লইয়া রাগিণী আলাপ করিতেছেন। তবল্‌চী তবলায় সঙ্গত করিয়া চলিয়াছে। যন্ত্র-ঝঙ্কারে বাতাসে যেন মৃদু তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—ঝড়ের বাতির শিখা মৃদু মৃদু কম্পিত—ঘরের সমস্ত ধাতব-পাত্রের মধ্যে সে ঝঙ্কারে রেশ সঞ্চারিত—করস্পর্শে বেশ অনুভব করা যায়। সঙ্গীতে যেন ঘরখানা ভরিয়া উঠিয়াছে।

অকস্মাৎ জলসা-ঘরের বারান্দায় আর্ত্তনাদ করিয়া কে আছাড় খাইয়া পড়িল। সে আর্ত্তনাদ যত মর্ম্মভেদী—সে কণ্ঠস্বরও তেমনি ভয়াবহ কর্কশ। মুহূর্ত্তে রাক্ষসের মত সে আর্ত্তনাদ পুঞ্জীভূত সঙ্গীত-

ঝঙ্কারকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ঘরশুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল, অতর্কিতে চকিত যন্ত্রীর যন্ত্রের তার ছিঁড়িয়া গেল।

বীজনগড় হইতে আসিবার পথে আকস্মিক একটা ঝড়ের তাড়নায় ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিতে পড়িয়া বজ্‌রাডুবী হইয়াছে। রায়-গিন্নী, বিশ্বেশ্বর—কেহ ফেরেন নাই। ফিরিয়াছে এক কালী বাগ্দী। বারান্দার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল কৰ্দ্দমলিপ্ত দীর্ঘাকৃতি প্রেত-মূৰ্ত্তির মত কালী।

রায় গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা, তারা!

তারপর অন্ধকার স্তব্ধ রায়-বাড়ী। গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে কালী-মন্দিরের প্রাঙ্গণে রব উঠিতেছিল—তারা—তারা!

নাটমন্দিরে পদচারণা করিতে করিতে রাবণেশ্বর সহসা স্তব্ধ অন্ধপুরীর দিকে চাহিয়া ভাবিলেন—আর জলসা-ঘরে আলো জ্বলবে না। রায় বংশ আজ নিৰ্ব্বংশ! রায়-বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা ভুবনেশ্বর রায় যেদিন গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন—সেইদিন ওই ঘরে জলসার বাতি জ্বলিয়াছিল। আজ চিরদিনের জন্য নিভিয়া গেল!

কোন মতে পুণ্যাহ সমাপ্ত হইল। পুণ্যাহের পরদিন রায়-কৰ্ত্তা নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন—শ্রাদ্ধের ফৰ্দ্দ কর। পুরোণো ফৰ্দ্দে হবে না, নতুন ফৰ্দ্দ কর। রায়-বাড়ীতে এত বড় শ্রাদ্ধ যেন আর কেউ না ক'রে থাকে। দশ দিনের মধ্যেই আমি কাজ শেষ করব।

রায়-কৰ্ত্তা নিজে অন্দরের মধ্যে বসিয়া মুসুবিদা আরম্ভ করিলেন দানপত্রের। সমস্ত সম্পত্তি দেবত্রে অর্পণ করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন। এ অন্ধকার পুরীতে—আর নয়। মা আনন্দময়ীর প্রজা তিনি—নিরানন্দ রাজ্যে থাকিতে তিনি পারিবেন না। বার বার ব্রজরাণীর প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিলেন—তুমি

জানতে পেরেছিলে, ঐশ্বর্য্য তোমায় মত্ত ক'রতে পারে নি। তারা—তারা!

ধন ও জনের অভাব রায়-বাড়ীর ছিল না, কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রাদ্ধের উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। সময় সংক্ষেপের জন্য সমস্ত ফর্দ্দ শ্রীরামপুর হইতে ছাপা হইয়া আসিল।

দেশ-দেশান্তর হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবে রায়-বাড়ী শোকের সমারোহে মুখর হইয়া উঠিল। হাজারে হাজারে সমাগত কাঙালীতে রাজারামপুর ভরিয়া গেল। মহলে মহলে নিমন্ত্রণ গিয়াছিল—মাতব্বর মণ্ডল প্রজাও সকলে আসিয়াছিল। পুণ্যাহে না আসিলেও হুদ্দাশ্যামপুরের প্রজারা এবার না আসিয়া পারিল না।

রায় বলিলেন—এসেছ তোমরা ভালই হয়েছে। গিন্নীর একটা অনুরোধ ছিল তোমাদের কাছে—আমিই সেটা জানাই। তোমরা দুঃখ পেয়েছ—তোমাদের সে দুঃখে তিনি কাতর হয়েছিলেন। তোমাদের যার যা ক্ষতি হয়েছে সেটা তোমরা গ্রহণ কর।

প্রজারা এবার সত্যই রাজার পায়ে গড়াইয়া পড়িল।

রায়-কর্ত্তা অবিচলিত অশ্রুহীনচক্ষে পত্নীপুত্রের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া শেষ করিলেন। একে একে সমাগত ব্যক্তিরা বিদায় লইলেন। হরিনারায়ণও আসিয়াছিলেন, তিনি অপরাধীর মত বলিলেন, আমার অপরাধ আমি ভুলতে পারছি না রায়মশায়। আমিই নিমিত্ত হলাম।

রায় হাসিয়া বলিলেন—নিমিত্ত মানে হ'ল কারণ। আনন্দময়ীর প্রসাদী কারণ একটু খাবে হরিনারাণ, তাহলে বুঝবে কারণের মালিক কে?

হরিনারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাবা মা একটা কথা আপনাকে জানিয়েছেন।

—বল।

ইতস্তত করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন—বলেছেন ব্রজরাণীর অভাবে এত বড় রায়বংশ যেন ভেসে না যায়।

—তারা—তারা!

কর্ত্তা ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন—রায়বংশের শেষের কথা এই মুহূর্ত্তে হরিনারায়ণ তাঁহার প্রত্যক্ষ চিন্তার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে। বহুক্ষণ পরে হরিনারায়ণ আবার বলিলেন—আমার কথা এখনও শেষ হয় নি রায়মশাই।

রায় বলিলেন—বল তুমি হরিনারাণ, মাকে ডাকার ত সময় অসময় নাই! ডাকলাম একবার এমনি। বল, কি বলবে বল।

—বাবার মায়ের অনুরোধ, আমারও প্রার্থনা আপনার কাছে—নন্দরাণীকে আপনি—।

—অর্থাৎ আমার শালা ডাক তোমার বড়ই মিষ্ট লাগে—কেমন? বলিয়া তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নন্দরাণী হরিনারায়ণের সর্ব্বকনিষ্ঠা বিবাহযোগ্যা ভগ্নী। হরিনারায়ণ কিন্তু এ হাসিতে মাথা নত করিয়া রহিলেন আর তিনি অনুরোধ করিতে পারিলেন না। সর্ব্বশেষ বিদায় লইলেন তিনি।

রায় এবার নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, সমস্ত এবার চুকিয়ে দাও, আর বাকী কি?

—আজ্ঞে হিসেব-নিকেশ হ'তে এখনও কিছুদিন লাগবে। তা ছাড়া ভাণ্ডারই এখনও ভাঙ্গা হয় নি। সব জিনিষই দেখছি—অনেক উদ্বৃত্ত হয়েছে—কোন জিনিষ ছ-আনা, কোন জিনিষ সিকি—।

বাধা দিয়া বিরক্তিভরে রায় বলিলেন—থাক—ভাণ্ডার যেমন আছে তেমনি থাক। তুমি এই কাগজগুলো একবার দেখে দলিলে চড়িয়ে নিয়ে এস। এক গোছা কাগজ তিনি নায়েবের হাতে তুলিয়া দিলেন। কাগজ গোছার একখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া নায়েব সকাতরে প্রভুর পানে চাহিল। রায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়ে অদূরবর্ত্তী

ভরা গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই দলিল দস্তাবেজ প্রস্তুত হইয়া গেল। রায় সেদিন ভাবিতেছিলেন—এগুলি সদরে লইয়া গিয়া পাকা করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু দারুণ বর্ষা নামিয়াছে—বর্ষণের আর বিরাম নাই, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। এই দুর্য্যোগের মধ্যে।

সহসা তাহার হাসি আসিল—দুর্য্যোগ! এখনও দুর্য্যোগের ভয়! আবার মনে হইল—আর পাকা করিবারই প্রয়োজন কি? যে বস্তু ত্যাগই করিবেন—তাহার জন্য আবার মায়া কেন—বন্দোবস্ত করিয়া ত্যাগের কি কোন অর্থ আছে? খোলা সিন্দুকের সম্মুখেই দলিলগুলি পড়িয়া রহিল—সিন্দুকের চাবী পড়িয়া রহিল শয্যার উপর। রায় গঙ্গার দিকের জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলেন। বৃষ্টির ঝাটে বাতাসে ঘরখানা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল, তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। তাঁহার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না—সবিস্ময়ে তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দুই কূল ভাসাইয়া গঙ্গা পাথার হইয়া উঠিয়াছে! আর কি গর্জ্জন! কিন্তু এত ফেণা কেন? রাশি রাশি পদ্মপুষ্পের মত যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। বহুকাল গঙ্গার এমন ভৈরবী মূর্ত্তি তিনি দেখেন নাই! থাকিতে থাকিতে সব চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া ওই গঙ্গার সলিলরাশির মধ্য হইতে ব্রজরাণী ও বিশ্বেশ্বরের মুখ ভাসিয়া উঠিল। গঙ্গার রাক্ষসী রূপ দেখিয়া তাহাদের কথাই মনে জাগিয়া উঠিল।

হুজুর!

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নায়েব আসিয়া বহির্দ্বার হইতে ডাকিল কিন্তু সে ডাক রায়কর্ত্তার কানে পৌঁছিল না। সাহস করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

—সর্ব্বনাশ হয়েছে হুজুর—ওপরে দীঘলমারীর বাঁধ ভেঙেছে।

বানের জল ছুটে আসছে তালগাছের মত উঁচু হয়ে।

রায়ের কানে গেল না। তিনি ভাবিতেছিলেন ওই যে গঙ্গার কল-কল্লোল—ও কি তাঁহার ব্রজরাণীর ডাক! ব্রজরাণী এত মুখর হইল কি করিয়া!

নায়েব আর একবার ডাকিল—কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া অগত্যা চলিয়া গেল।

এতক্ষণ পর রায় হঠাৎ ডাকিলেন—কে রয়েছিস?

একজন খানসামা আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি বলিলেন, কেলে বাগ্দীকে পাঠিয়ে দে! সে চলিয়া গেল, রায় তেমনিভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কালীচরণ আসিয়া নত মুখে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

রায় বলিলেন—সন্ধ্যের সময় কালীবাড়ীর ঘাটে একখানা ডিঙ্গি নিয়ে তৈরী থাকবি। সঙ্গে কাউকে দরকার নাই। আমি ধরব বোটে।

নিঃশব্দে কালীচরণ চলিয়া গেল। ভৃত্যটা এবার সাহস করিয়া বলিল, হুজুর সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেল!

পরম প্রসন্নকণ্ঠে রায় বলিলেন—হ্যাঁ রে, নিয়ে আয় আমার কাপড় নিয়ে আয়—স্নান সেরে মন্দিরে যাব। তারা—তারা!—ও কি গোলমাল কিসের রে নীচে?

—আজ্ঞে গাঁয়ে বান ঢুকেছে তাই লোকে চীৎকার করছে।

রায় দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন। কালীবাড়ী গোবিন্দবাড়ীর সম্মুখ তখন দরিদ্র নরনারীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সামান্য সম্বল পোঁটলায় বাঁধিয়া মাথায় করিয়া শিশু নারীর হাত ধরিয়া রায়-বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষুধাতুর শিশু বালকের চীৎকারে চারিদিক যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

রায় প্রথমেই বলিলেন—ফটক খুলে দাও—ফটক খুলে দাও।

নায়েব বলিল—সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—ওপরে দীঘলমারীর বাঁধ ছুটেছে।

রায় শিহরিয়া উঠিলেন—সর্ব্বনাশ—তাহ'লে গ্রাম যে ডুবে যাবে! মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—এখুনি তুমি বেরিয়ে পড়। গ্রামের সমস্ত ভদ্র পরিবারকে জোড়হাত ক'রে আহ্বান জানিয়ে এখানে নিয়ে এস। অন্দর সদর সমস্ত মহল খুলে দাও।

ওদিকে ক্ষুধার্ত্তের দল চীৎকার করিতেছিল—রাজাবাবু খেতে দাও। হুজুর, রক্ষে কর।

রায় নায়েবের দিকে চাহিলেন—নায়েব বলিল, কোন ভাবনা নাই—গিন্নী-মায়ের শ্রাদ্ধের ভাণ্ডার এখনও পরিপূর্ণ।

রায় ঊর্দ্ধমুখে ব্রজরাণীকে স্মরণ করিলেন। এ কি—কে—কে?

নায়েব ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, উঠুন—উঠুন—গাঙ্গুলী মশাই! কি হ'ল কি?

বৃদ্ধ নবীন গাঙ্গুলী আসিয়া রায়-কর্ত্তার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে।

রায় তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া প্রতি-প্রণাম করিয়া কহিলেন—বলুন আমাকে কি করতে হবে?

গাঙ্গুলী বলিল, রক্ষে করুন রায় মশাই, আমার মান ইজ্জত সব গেল। আমার কন্যার আজ বিবাহ। পাত্রপক্ষ এসে গেছে। কিন্তু হঠাৎ বন্যাতে আমার সব পণ্ড হ'ল। তৈরী রান্নার ওপর রান্নাঘর ভেঙে পড়েছে।

রায় নিজেই অগ্রসর হইয়া বলিলেন—আপনার নয়—আমার কন্যার বিবাহ। ভয় কি আসুন, বিবাহ হবে রায়-বাড়ীতে। চলুন আমি পাত্র নিয়ে আসি।

নায়েব হাঁক দিয়া কহিল—ছাতা—ছাতা।

সমস্ত রায়-বাড়ী সদরঅন্দর গ্রামের লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চীৎকারে কলরবে গঙ্গার গর্জ্জনও ঢাকা পড়িয়াছে। বন্ধ আছে শুধু

রায়-কর্ত্তার শয়নকক্ষ লক্ষ্মীর ঘর ও জলসা-ঘর।

রায়-কর্ত্তা ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন, আর মুহূর্মুহূঃ বাহিরেরদিকে চাহিতেছিলেন। প্রগাঢ় অন্ধকারের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন।

নায়েব আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, বিবাহের আসর কোথায় হবে—নাটমন্দির সব ভরে গেছে।

হুকুম হ'লে জলসা ঘরে—কথা সে সমাপ্ত করিতে পারিল না। রায়ের কানে কিন্তু কোন কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি অন্যমনস্ক ভাবেই বলিলেন—হুঁ।

নায়েব চলিয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া রায় ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন। পরিধানে একমাত্র বস্ত্র—নগ্ন পদ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত সম্বল নাই—হাতে শুধু এক লাঠী লইয়া রায় অন্দরের খিড়কীর পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

গভীর অন্ধকার—ভীষণ দুর্য্যোগ।

রায় ঘাটে আসিয়া ডাকিলেন—কেলে!

অন্ধকারে গাঢ়তর অন্ধকারের মত কালীচরণ নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। রায় একবার রায়-বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

এ কি, জলসা-ঘর আলোয় আলোময় হইয়া উঠিয়াছে যে! উন্মুক্ত সুবৃহৎ জানালার মধ্য দিয়া রায় দেখিলেন জলসা-ঘরে বিবাহের মণ্ডপ স্থাপিত হইয়াছে। একদিকে দাঁড়াইয়া বর-কন্যা তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। ঘন ঘন হুলু ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে জলসা-ঘর উৎসবময়ী হইয়া উঠিয়াছে! রায় দেখিলেন—বাতিদানের বাতিগুলি সমস্তই ছোট ছোট, প্রায় অর্দ্ধেক। ওঃ—সে দিনের নির্ব্বাপিত অর্দ্ধদগ্ধ বাতিগুলি আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

রায় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলেন, একি পনের দিন পূর্ব্বে—নির্ব্বংশ রায়-বাড়ীতে আজ এই ঘনায়মান দুর্য্যোগের মধ্যে—

পৃথিবী যখন আর্ত্ত চীৎকারে ভরিয়া উঠিয়াছে—তখন কেমন করিয়া সেখানে বিবাহের বাসর সাজিয়া উঠিল! অকালে নির্বাপিত দীপ-মালা—এই দুর্য্যোগের অন্ধকারে এই পরম মুহূর্ত্তটীতে কে জ্বালাইয়া দিল। তাঁহার চোখ দিয়া জল আসিল—তিনি সজলচক্ষে সেই অন্ধ-কারের মধ্যে মৃত্যুবর্ষণ মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাশে নির্ব্বাক কালীচরণ।

এদিকে নাটমন্দিরে ঘন ঘন আহার-তৃপ্ত ক্ষুধার্ত্তেরা জয়ধ্বনি তুলিতে-ছিল—অক্ষয় হোক রায় হুজুরের রাজত্বি, জয় হোক। আমরা সুখে বেঁচে থাকি। রায় আবার জলসা-ঘরের দিকে চাহিলেন। দেওয়ালে বিলম্বিত তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রতিকৃতিগুলি সজল বাতাসে মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। এ-কি—ভুবনেশ্বর রায়—ত্রিপুরেশ্বর রায় কি তাঁহাকে ডাকিতেছেন? তিনি গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—তারা—তারা—আনন্দময়ী তারা!

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি বলিলেন—ফিরে আয় কেলে।

কালীচরণ—নিঃশব্দে দ্রুত পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া কালীবাড়ীর রুদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত করিল।

ছিন্ন ফর্দ্দখানায় এই ইতিহাস, শুধু শ্রাদ্ধই নয়—ওই ফর্দ্দে বিবাহও হইয়াছে। সুধাংশুর পিতামহী রায়-বাড়ীতে বিবাহিতা—সেই গাঙ্গুলীর কন্যা।

বিংশ শতাব্দীর এই অবিশ্বাস, সংশয় ও হতাশার যুগে একটি পতিত অভিশপ্ত আত্মার উদ্ধারের কাহিনী বলতে যাচ্ছি শুনলে অনেকের নাসা কুঞ্চিত, অনেকের চোখ সকৌতুক বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠবে জানি।

কিন্তু সত্যই স্তুব্রতের জীবনে এমনি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে।

এযুগে আমরা সবাই অল্প বিস্তর অভিশপ্ত, পতিত। আমাদের বিবর্ণ জীবনে মৃত্যুর হিমস্পর্শ লেগেছে। আমাদের আকাশ শূন্য হয়ে গেছে, পৃথিবী যান্ত্রিক প্রাত্যহিকতায় কঠিন।

এই মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কি তপস্যা আমরা করতে পারি? তপস্যায় বিশ্বাসও আমরা হারিয়েছি। শুধু একদিন স্তুব্রতের মত দৈবের অযাচিত অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে বিদ্যুৎ-ছটায়, এইটুকুই আমাদের আশা।

কলকাতার ওপর সেদিন শীতের সন্ধ্যার গাঢ় কুয়াসা নেমেছে। কুয়াসা নয়—তার ছলনা। ধোঁয়া ও ধূলির ষড়যন্ত্র। কিন্তু তার জন্যেও বুঝি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। রূঢ় বাস্তবতাকে মুছে দিয়ে সে কুয়াসা রহস্যের ইঙ্গিত এনেছে ক্লান্ত নগরের চোখে। দিনের গ্লানির কথা দিয়েছে ভুলিয়ে। সে কুয়াসার ছোঁয়ায়, মনে হয়, সমস্ত রুক্ষতার আড়ালে নগরের যে অপরূপ হৃদয় আমাদের কাছে গোপন থাকে তাই যেন অস্পষ্ট অন্ধকারে অকস্মাৎ নিজেকে প্রকাশ করেছে।

এই কুয়াসা আমাদের মনের ওপরও নামে বুঝি ; প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার শৃঙ্খল থেকে আমরা পাই মুক্তি। মনে হয় দিনের পৃথিবী এই মায়ালোকে আর আমাদের অনুসরণ করতে পারেনি। অস্তিত্বের আর কোন পৃষ্ঠায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি।

খানিকক্ষণের জন্য এবার নিজেদের ভুলতে পারব যেন। ভোলাই বা কেন, সেই হয়ত সত্যকার জানা। দিনের আলোয় নিজেদের সত্তার স্পষ্ট অথচ সীমাবদ্ধ যে অর্থ আমরা পেয়েছি তাই অসম্পূর্ণ। রাত্রি সে অর্থকে প্রসারিত করে দিয়েছে।

সুব্রতের অন্ততঃ তাই মনে হয়। এই কুয়াসাচ্ছন্ন নগরের পথে নিরুদ্দেশ্য ভাবে ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগে। জীবনের কাহিনী যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা সেইদিনের পাতাগুলি মুড়ে সে যেন আর কোন অস্তিত্বের আভাস পায় এই অন্ধকারে।

যেন কোথায় আছে অনাবিষ্কৃত ব্যাখ্যা জীবনের। পৃথিবী যখন অন্ধকারে নিজের সীমা লঙ্ঘন করে তারকালোক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় সেই অপরূপ অবসরে সে ব্যাখ্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সে-ইঙ্গিত সমস্ত মন দিয়ে গ্রহণ করবার শক্তি বুঝি তার নেই। তবু সে অনুভব করতে ভালবাসে নিজের এই অপ্রত্যাশিত বিস্তৃতি, চারিধারের রহস্য-সঙ্কেতের মাঝে।

সুব্রতকে সামান্য একটু পরিচিত করবার চেষ্টা করা যাক। বাইরের পরিচয় নয় ভেতরের—নিজেকে সুব্রত যেমন জানে।

সুব্রত যেখানে এসে পৌঁচেছে, সেখানে অস্তমান যৌবনের আলো এখনো আছে, কিন্তু নেই উজ্জ্বলতা। দেহের নয় মনের যৌবনই এসেছে তার ম্লান হয়ে। সে ক্লান্ত—আত্মার দুঃসহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। আশা, আদর্শ, প্রেরণার ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে বাস করছে। প্রতিদিনের সূর্য্যোদয়কে সাগ্রহে অভিনন্দিত করবার উৎসাহ আর তার নেই। এমনভাবে জীবনের ভগ্নস্তূপের মধ্যেই নির্ব্বিকারভাবে আরো অনেকে

বাস করে। কোন অসন্তোষ, কোন অভাবের বেদনা তাদের থাকে না। যৌবন যে ব্যর্থ স্বপ্ন ও ভগ্ন-আশার জঞ্জাল তার যাত্রাপথে ফেলে চলে যায় তাই নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে তারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেপরিতৃপ্ত ভাবে। তারা নিজেদের পরিচয়ও জানে না।

কিন্তু সুব্রত তেমন নয়। সে জানে যে সৃষ্টি তার কাছে বিবর্ণ হয়ে এসেছে মনে আর তার রঙ নেই বলে। তার মনে ধূসর হতাশায় আচ্ছন্ন। অনেক ভাবাবেগ, অনেক অনুভূতির প্রত্যন্ত প্রদেশ ঘুরে এসেও সে কিছু পায়নি সঞ্চয় করে রাখবার মত। সমস্ত জীবনকে ছন্দোবদ্ধ ভাবে বেঁধে রাখা যায় এমন কোন বিশ্বাসের সম্বল তার নেই।

মনের এই নীরব নিরবচ্ছিন্ন ঊষরতার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতে হয় একদিন।

রাত্রির এই কুয়াসা-স্নিগ্ধ সান্ত্বনার জন্যে তখন বেরুতে হয় পথে। হোক তা কুয়াসার ছলনা মাত্র।

সুব্রত এরিমধ্যে অনেকখানি ঘুরেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কলকাতার রাস্তাগুলি এক একটি আলাদা জগৎ—তাদের নিজস্ব বিভিন্ন রূপ আছে—বুঝি পৃথক আত্মাও আছে। দিনের আলোয় প্রয়োজনের শাসনে তারা এক হয়ে থাকে, তারপর রাত্রির সম্মোহনে নিজেদের তারা উন্মুক্ত করে দেয়। তখনই পাওয়া যায় তাদের সত্যকার পরিচয়।

হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায় দীর্ঘ একটি খাড়া প্রাচীর সমেত বাড়ী কোন রাস্তাকে অদ্ভুত একটি ব্যঞ্জনা দিয়েছে। দিনের বেলা যে গাছ চোখেও পড়েনি রাত্রে হঠাৎ সে-ই কোন পথের মর্ম্মস্থল অধিকার করে তার অপরূপ রহস্য করেছে উদঘাটিত।

বাড়ীগুলির রেখা ও আলো-ছায়ার বিচিত্র বিন্যাসে এক একটি

রাস্তার রূপ ও অর্থ গিয়েছে বদলে।

নির্জ্জন কয়েকটা রাস্তা ঘুরে সুব্রত তখন বুঝি চৌরঙ্গির কাছাকাছি এসে পড়েছে। এ রাস্তাটিও নির্জ্জন। নগরের বর্ণাঢ্য উচ্ছলিত স্রোত আর খানিক দূরেই যে ফেনায়িত হয়ে উঠেছে জনতায়, আলোয়, কলরবে, এখান থেকে তা বোঝা কঠিন। শান্ত গাঢ় ছায়াচ্ছন্ন পথ তুধারের বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের রহস্য-স্পর্শ নিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে যেন অপরূপ কোন মধুর কাহিনী-লোকে।

সুব্রতকে সে পথ নিত্যকার বিবর্ণ ক্লান্ত পৃথিবী থেকে সত্যই জীবনের আর এক পৃষ্ঠায় নিয়ে গেল।

অনেক দূরে দূরে এক একটি আলোর স্তম্ভ। সে আলোর সঙ্গে যেন অন্ধকারের কোন বিরোধ নেই। সে আলো কিছুকে অতি স্পষ্ট করে তুলতে চায় না, অন্ধকার কিছুকে একবারে ঢেকে রাখে না। আলো অন্ধকার মিলে একটি তরল অপরূপ অস্পষ্টতা সৃষ্টি করেছে।

সুব্রত খানিক এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। কে যেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে। অস্পষ্টতা যেখানে গাছের ছায়ায় গাঢ় হয়ে উঠেছে সেখানে কে যেন তাকে থামতে ইসারা করলে।

আবছায়া নারীমূর্ত্তি—যেন এই পথেরই আত্মা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

জানি পাঠক আর আমার সঙ্গে এগুতে নারাজ।

কলকাতার রাস্তায় যেখানে খুসী একটি সঙ্কেতময়ী অপরিচিত মেয়েকে গল্পের প্রয়োজনে হাজির করার অপরাধ তাঁরা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন।

তবু সত্যের খাতিরে আমায় এগিয়ে যেতেই হবে। তাছাড়া মেয়েটি অপরিচিত নয়।

সুব্রতও তা বুঝতে পারলে মেয়েটি আলোর কাছে এগিয়ে আসার পর।

"তুমি!"

মেয়েটির মুখ ভাল করে এখনো দেখা না যাক, তার শরীরের হিল্লোলটি বোঝা গেল এ কথায়। "আমি-ই! আমায় এখানে দেখবার আশা নিশ্চয়ই করনি।"

"করা কি স্বাভাবিক।"

"না, কিন্তু আমায় এখানে কেন, কোথাও দেখবার আশা তুমি করনি। দেখতে চাওনি।"

সুব্রত নীরব।

মেয়েটি বল্লে—"তা জানতাম!"

তারা দুজনে এবার চলতে সুরু করেছে।

মেয়েটি আবার বল্লে—"বিশ্বাস করতে পার, আমিও তোমার জন্যে ওৎ পেতে ছিলাম না ওই নির্জ্জন রাস্তায়।"

"বিশ্বাস না করতে পারলেই খুসী হতাম যে!"

"তা হতে পারে। তোমার অহঙ্কারের সীমা নেই!"

"সে অহঙ্কারকে তুমিই যে প্রশ্রয় দিচ্ছ মীরা।"

"প্রশ্রয়ের অপেক্ষা তুমি রাখ না।"

"আমার ওপর বড় বেশী অবিচার করছ নাকি?"

মীরা একটু শুষ্ক হাসি হাসল।

"এতদিন বাদে দেখা হওয়ার পর আমাদের আলাপটা ঠিক্ সঙ্গত হচ্ছে না বোধ হয়।"

"দেখা হওয়াটাই যে অসঙ্গত। সুতরাং সেটার ওপর জোর নাই দিলে। আর এইখানেই আমায় বিদায় নিতে হচ্ছে।"

কথা বলতে বলতে তারা অনেক দূরে এসে পড়েছে—পথের নির্জ্জনতা এবার শেষ হয়েছে। চারিধারে উজ্জ্বল আলো আর জনতা।

সুব্রত হঠাৎ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে মীরার হাতটা ধরে ফেল্লে। হেসে বল্লে,—"তা হয় না মীরা। এমন আরম্ভের আচমকা এমন শেষ

হওয়ার কথা কোন বইয়ে লেখে না।"

মীরা এবার না হেসে বুঝি পারলে না।

জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় ?"

"কোন রেস্তরাঁয়।"

"না"

"তবে চল ময়দানে !"

মীরা কোন উত্তর দিলেনা। বড় রাস্তায় পড়বার পর একটা ট্যাক্সি খানিক আগে থাকতেই শ্বাপদের মত তাদের পিছু নিয়েছে। সুব্রতের ইসারায় কাছে এসে দাঁড়াল।

ট্যাক্সির ভেতর বসে সুব্রত বুঝি আমাদের একটু অবাক করে দিলে। তাকে এতক্ষণ অত্যন্ত সংযত বলেই মনে হয়েছে।

তার বাঁহাতটা মীরার পিঠের পেছন দিয়ে লুকিয়ে কখন এগিয়ে গেছে। হঠাৎ মীরা একটা আকর্ষণ অনুভব করলে।

"মীরা, ক্ষমা করো, তোমায় আজ অপরূপ দেখাচ্ছে !"

মীরা কিছু না বলে ধীরে ধীরে সুব্রতের হাতটা সরিয়ে একটু সরে বসল।

সুব্রত নিঃশব্দে খানিকক্ষণ রইল বসে, তার পর বল্লে, "এবারে আমি কৈফিয়ৎ দেবার জন্য প্রস্তুত !"

"কৈফিয়ৎ নেবার জন্যে আমি আসিনি—"অত্যন্ত গম্ভীর স্বর—একটু তিক্ত।

সুব্রত হাসল ; কিন্তু তার হাসির রঙ বদলে গেছে।— "তা জানি মীরা, কিন্তু গরজ আমার নিজেরই !"

মীরার এবারকার জবাবটা যেন সুব্রতের মুখের ওপর চাবুকের মত লাগল। মীরা কঠিন স্বরে বল্লে, "কিসের জন্যে ! একটু ভণিতা না করলে হঠাৎ অভিনয়ের পালা সুরু হওয়া বেমানান হয় বলে ত ! তুমি ওটুকু উহ্য রেখেই সুরু করতে পার !"

বিবর্ণ মুখে সুব্রত অনেকক্ষণ বুঝি চুপ করে বসে রইল। মীরাও কথাটা বলবার পর মুখ ফিরিয়ে বসেছে।

ট্যাক্সি চৌরঙ্গিতে এসে পড়েছে এরি মধ্যে। দ্রুত তাদের মুখের ওপর দিয়ে রাস্তার আলো-ছায়া সরে যাচ্ছে। মুখের ভাব কারুর কিছু বুঝবার যো নেই। তারা যেন পাশাপাশি থেকেও বহুদূরে সরে গেছে পরস্পরের কাছ থেকে। দুস্তর এই ব্যবধান। তাদের দুধার দিয়ে পথ বয়ে যাচ্ছে নদীর মত ; মাঝখান দিয়ে সময়ের স্রোত। সে স্রোত তাদের জীবনে কি নূতন কোন উপলব্ধি এনে দিলে ? বলা যাচ্ছে না এখনও।

অনেকক্ষণ বাদে সুব্রত বল্লে,—"ময়দানে যাবার দরকার নেই মীরা, চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।" তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বল্লে,—"কোথায় তুমি যাচ্ছিলে, কবে তুমি এলে, তাইত জিজ্ঞাসা করা হয়নি এতক্ষণ।"

"তার কোন দরকার ছিল না।" এখনও স্বরে একটু ঝাঁঝ আছে।

সুব্রত সে কথা যেন শুনতে পায়নি ; জিজ্ঞাসা করলে আবার,—

"কোথায় তখন যাচ্ছিলে ?"

"কোথাও না !"

"তার মানে !"

"কাল সবে কলকাতায় এসেছি পিসিমাদের বাড়ী। তাঁদের সঙ্গেই বায়স্কোপে গেছলাম। ভাল লাগলো না বলে মাঝখানে উঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম।"

"আশ্চর্য্য ! তাঁরা কি ভাবছেন !"

"ভালো কিচ্ছু ভাবছেন না বোধ হয় !"

"না তা বলছি না, খুব হয়ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন।"

"তোমার সঙ্গে আছি জানলে বোধহয় হতেন না !"

ব্যথিত স্বরে সুব্রত বল্লে—"আমায় আঘাত দিতে তুমি অবশ্য পার

মীরা।"

"তাই নাকি!"

ব্যঙ্গের স্বর উপেক্ষা করে সুব্রত বল্লে,—"তুমি আমার পরিচয় বোধ হয় ঠিক্ই জেনেছ মীরা! এক যায়গায় ধরা পড়্তেই হয়। তবু এখন আমার মনে হচ্ছে আমার আরেকটা পরিচয় আছে, আর সেইটাই আসল। সেটা এখনও আবিষ্কার করবার সময় আছে।"

"বুঝতে পারলাম না।"

"দাঁড়াও বোঝাচ্ছি! কিন্তু আগে ট্যাক্সি কোথায় যাবে বল! তোমার পিসিমার বাড়ী না বায়স্কোপে?"

মীরা খানিক চুপ করে থেকে বল্লে—"ময়দানেই যাব!"

"না রাত হচ্ছে! তোমায় না দেখতে পেয়ে ওঁরা নিশ্চয় খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সিনেমায় না হয় তোমাদের বাড়ীতে চল।"

মীরার কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

"কি ভাবছ?" জিজ্ঞাসা করলে সুব্রত।

"ভাবছি, তোমার এমন একটা সুযোগ নষ্ট হ'ল।"

"নষ্ট হয়নি ত!"

"হেঁয়ালিটা আমার কাছে দুর্বোধ।"

"হেঁয়ালি নয় মীরা। তুমি হয়ত শুন্লে হাসবে! কিন্তু তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, এ আমার ফিরে যাবার চেষ্টা!"

"না হেসে পারলাম না। অত রঙ দিয়ে কথা বলা তোমায় মানায় না!"

"সব রঙ উজাড় করেও প্রকাশ করা যায় না এমন কথাও বলার দিন জীবনে আসে। হয়ত আমার এসেছে।"

"অবহেলা সহ্য হয়েছিল উপহাসটা হচ্ছে না।"

"উপহাস নয় মীরা। আমার নিজেরই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না, কিন্তু তোমাকে সত্য করে ফিরে পাওয়ার জন্যই ফিরিয়ে নিয়ে

যাচ্ছি।" সুব্রতের গলার স্বর সত্যি ভারি হয়ে এসেছে আবেগে।
মীরা ম্লান একটু হাসল—"কিন্তু এক ঘণ্টা আগে আমিত তোমার মনের সুদূর কোন কোণেও ছিলাম না!"
"না, ছিলে না। কিন্তু এখন আছ এবং সেই থাকার কাছে সমস্ত অতীত মিথ্যা হয়ে গেছে জেনো।"
"এসব সেই নির্জ্জন রাস্তা আর হঠাৎ সাক্ষাতের যাদু নয় ত!"
"তাই যদি হয় ক্ষতি কি! সে যাদু সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত কালকে ছুঁয়ে দিক্।"
"বড্ড চড়া রঙ তোমার কথায়।"
"মনের রঙ আরো যে চড়া!"……

সে রাত্রে সুব্রত ও মীরার কাছে ওই খানেই আমরা বিদায় নেব। এবং তারপরের সকালে একেবারে উঠব গিয়ে সুব্রতের ঘরে।
ঘরটা অত্যন্ত প্রশস্ত। এধার ওধার কয়েকবার পায়চারী করলে প্রাতর্ভ্রমণের কাজ সারা হয়। এত বড় ঘরকে কিছুতেই যেন আপনার করে নেওয়া যায় না। এ ঘরে বড় বেশী ফাঁক থেকে যায়। অন্তরঙ্গ নয় এঘর, যেন উদাসীন।
সুব্রতের এই ঔদাসীন্য এতদিন বাজেনি। কিছুই তার বাজেনি। তার মন ছিল নিঃসাড়। প্রাণের উৎসই তার বুঝি গিয়েছিল শুকিয়ে। আর নিজের এই নিয়তিকে সে স্বীকার করে নিয়েছিল। এমনি করে তাকে টেনে চলতে হবে দিনের পর দিন অস্তিত্বের শ্রান্ত ধারা। সে ধারা আর উঠবে না আবর্ত্তে ফেনিল হয়ে, প্রপাত হয়ে পড়বে না ঝাঁপিয়ে অনিশ্চিত কোন ভবিষ্যতে, আর আসবে না তার স্রোতে বন্যাবেগ। শুধু মন্থর ভাবে মনের ধূসরতায় সে যাবে ভেসে।
পৃথিবীর সাথে তার পরিচয় পর্দ্দার আড়াল থেকে অস্পষ্টভাবে, কোথাও উলঙ্গ সাক্ষাৎ হবে না আর কোন সত্যের আর কোন

সত্তার সঙ্গে। আত্মার গহনতায় অসীম তার হতাশা।
কিন্তু হঠাৎ কি আলো এল অন্ধকার বিদীর্ণ করে। মনের অন্ধকার সাগর উঠেছে দুলে। অন্ধকার ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে ফেনায়িত দীপ্তিতে। শুধু একটি মানুষের আকস্মিক আবির্ভাবে তার জীবনে এল এই অপরূপ জোয়ার! কোষ-মুক্ত তরবারের মত তার চেতনা উঠলো ঝিলিক দিয়ে!
কোন ঘটনা যায় মনের ওপর দিয়ে উদাসীন ভাবে চলে' আর কোন ঘটনা আসে চারিদিকে বিদ্যুৎস্পন্দন তুলে' অকল্পিত সম্ভাবনার। কাল রাতের ঘটনা যেন তাই। সাক্ষাৎ নয়, দুটি সত্তার সে বুঝি সঙ্ঘর্ষ। অন্ধকার আকাশের মৃত তারকাপিণ্ডও উঠেছে বহ্নি-দীপ্ত হয়ে সে সঙ্ঘর্ষে।
শুধু প্রেম বলে ত ব্যাখ্যা করা যায় না সত্তার এই সঙ্ঘাতকে, তার চেয়ে বেশী কিছু। বুঝি তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু!
সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে মীরাকে সে এতদিন অনায়াসে ভুলেই ছিল।
"তোমার মনের কোন সুদূর কোণেও আমি ছিলাম না।"
মিথ্যা সে ত বলেনি। বহুজনের ভীড়ে অতীতের স্মৃতিতে সে ছিল মিশে। তারপর একি আবির্ভাব! সত্যিই অতীত স্মৃতির সেই সদ্য কৈশোরাতিক্রান্তা উদ্ধত চঞ্চল প্রকৃতির মেয়েটির সঙ্গে এ-মীরাকে কিছুতেই মেলান যায় না। সে মীরা তখনও নারী হয়ে ওঠেনি। তাকে অবহেলা করবার ইচ্ছা হয়নি সুব্রতের, জয় করবার উৎসাহও নয়, আলগোছে পথের পরিচয় হিসাবে সে তাকে সম্ভাষণ করেছে অর্দ্ধ উদাসীন ভাবে, তারপর গিয়েছে ভুলে। মীরা তখন সঙ্গী হিসাবে উপভোগ্য। নারীত্বের আভাস তার ভেতর যে-টুকু ছিল তাতে মন স্নিগ্ধ করে রাখে কিন্তু অতিমাত্রায় সচেতন হতে বাধ্য করে না। ছেলেমানুষ হিসাবে তার ওপর খানিকটা মুরুব্বীয়ানার

ভাব থাকে অথচ একরকম সুন্দরী মেয়ে হিসাবে তার সঙ্গ ভালোই লাগে। কিন্তু ভালো লাগবার জন্যে মীরা নিজে থেকে সেদিন বিশেষ চেষ্টা করেছে বলে মনে হয় না।

যা ধারালো তরবারি হয়ে উঠবে সে ইস্পাতের পরিচয় তখনই বুঝি প্রকাশ পেয়েছিল।

পাতলা একটি মেয়ে, দেহ দীর্ঘ হয়ে উঠেছে ঊর্দ্ধোক্ষিপ্ত ফোয়ারার মত প্রথম যৌবনের প্রেরণায়, পায়নি এখনো সৌষ্ঠবের পূর্ণতা। তীক্ষ্ণতা তার চোখে, তীক্ষ্ণতা তার মুখের কথায়। ঘা না দিয়ে কথা কয় না, বিশেষ করে সুব্রতকে আহত করার চেষ্টায় তার একটা যেন বিশেষ আনন্দ আছে।

ভালোই লাগত অদ্ভুত তার এই বিরুদ্ধতা।

মীরার বাবা তখন মীর্জ্জাপুরে থাকেন।

শীতের শেষ, দুপুরের হাওয়ায় বেশ তাপ আছে। তারা চলেছে "টাণ্ড্রা ফল্‌সে" পিকনিক করতে। পরিকল্পনাটা মীরার দিদি ও জামাইবাবুর। তাঁরা কয়েক দিনের জন্যে তখন সেখানে বেড়াতে এসেছেন।

তখন সুব্রত বিন্ধ্যাচলে থাকে, স্বাস্থ্যের জন্য নয়, কাজের অছিলায়। সেও একবার কাজে লাগার চেষ্টা করছে। বিন্ধ্যাচলে সে একটা স্যানাটোরিয়াম গড়বার কল্পনা করছে। সেই সূত্রেই মীরার বাবার সঙ্গে আলাপ। মীরার বাবা তখন মীর্জ্জাপুরের সরকারী ডাক্তার। আলাপ থেকে গভীর ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হয়নি। সুব্রতের সে বিষয়ে সহজাত পটুত্ব ছিল।

কিন্তু মীরা সেদিন তার দৃষ্টির সীমার মধ্যে ছিল, লক্ষ্যের বিষয় নয়। চোখ দিয়ে সে দেখেছে মীরাকে, মন দিয়ে টের পায়নি। তাকে লক্ষ্য করল ভাল করে' বুঝি পিক্‌নিকের দিন। মনোযোগ দেবার সেদিন নানা দিক দিয়ে সুবিধে হয়েছিল—সময়টা এবং

স্থানটা অনুকূল, হাতের কাছে আর কেউ নেই। দল বেঁধে সবাই এদিক ওদিক সরে পড়েছে। কেমন করে মীরাই শুধু দলছাড়া হয়ে পড়েছিল কে জানে।

পিক্‌নিক্ নামেই। টাঙ্গায় করে ষোড়শোপচারে রান্নার উপকরণ এসেছে। এসেছে ঠাকুর চাকর দাসী। দিদি ও জামাইবাবু গেছেন যেখান থেকে সহরে জল সরবরাহ হয় সেই টাণ্ড্রার বিশাল বাঁধান হ্রদ দেখতে। মীরার বাবা ও মা কাছাকাছি এক সাধুর সন্ধান পেয়ে দুর্ব্বলতা আর চেপে রাখতে পারেননি। সুব্রত খানিকক্ষণ একলা পড়েছিল। তারপর মীরা এসে যোগ দিয়েছে।

সব কথা সুব্রত এখন মনে করতে পারে না। শুধু এইটুকু মনে আছে সমস্ত ঘটনার পেছনে পটভূমিকা ছিল টাণ্ড্রা ফল্‌সের প্রাকৃতিক দৃশ্য শুধু নয় তার অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন গর্জ্জন। সেই গম্ভীর বিরাম-বিহীন শব্দ কেমন করে যেন সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়, প্রভাব বিস্তার করে সমস্ত মনের ওপর।

ফল্‌সের ধারে পাকা কয়েকটা ঘর আছে যাত্রীদের বিশ্রাম করবার জন্যে। তারই দোতালার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার মালীকে দিয়ে পাতিয়ে সুব্রত ছিল বসে। হঠাৎ কাছে একটা ক্ষীণ স্বর শুনে সুব্রত চমকে উঠেছিল। মীরা এসে দাঁড়িয়েছে আলিসার কাছে।

হেসে সুব্রত বলেছিল—"ঝগড়া ছাড়া এখানে আর কিছু শোনা যাবে না মীরা! তুমি অনায়াসে কোমর বেঁধে লাগতে পার।"

তার নিজের স্বর নিজের কানেই অত্যন্ত ক্ষীণ শুনিয়েছিল। প্রপাতের আওয়াজ আর সমস্ত শব্দ ঢেকে দিয়েছে। মীরাও পায়নি শুনতে ভালো করে; কাছে সরে এসে গলা বাড়িয়ে বলেছিল—"ঝগড়ার কথা কি বলছেন?"

"শুনতে যখন পাওনি তখন আর দরকার নেই।"—তারপর ইজি-চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বলেছিল—"তুমি বস এইটায়, আমি

আরেকটা আনাচ্ছি।”

“থাক আমি বসব না। আপনার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ! এ জিনিষটা খুব আপনার দুরস্ত।”

“তোমাদের যেটা প্রাপ্য সেটা ত দিতে হবে।”

“আমাদের প্রাপ্য ওইটুকুই……”

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়েছিল বই কি! মীরার কাছে যেন একথা আশা করেনি। এবার ইচ্ছে করেই বলেছিল—“তোমাদের প্রাপ্য সসাগরা পৃথিবী কিন্তু আমরা এ যুগের অক্ষম দুর্বল পুরুষ, কতটুকু দিতে পারি। সৌজন্য দিয়ে তাই আমাদের দৈন্য ঢাকি।”

মীরা হেসে এবার চেয়ারটায় বসে বলেছিল—“আপনি ঘুমোবার আগে বোধহয় এসব কথা রোজ তৈরী করে রাখেন—না?”

“না, একটা বই কিনেছি; ‘মেয়েদের চমৎকৃত করবার একশ একটি জবাব’—সেইটে মুখস্থ করি। কিছুদিন বাদে হয়ত পুরাণ কথা দুবার বলে ধরা পড়ে যাব।”

এবার দুজনেই হেসে উঠেছিল। মালী তখন আর একটি চেয়ার এনে দিয়েছে। সুব্রত সেটায় না বসে বলেছিল,—“এখনো চেঁচিয়ে কথা বলা ক্ষুর দিয়ে কুটনো কোটার মত, ভাল কথারও ধার থাকে না। আপত্তি না থাকে ত চল একটু বেরিয়ে পড়ি।”

“আপত্তি ত আপনারই আছে মনে হচ্ছিল।”

“তখন ছিল, ভালো ভালো কথাগুলোর শ্রোতা পাইনি বলে।”

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মীরা বলেছিল—“কোন দিকে যাবেন?”

“সাধুজির আশ্রমে অদৃষ্টটা যাচাই করে আসি চল, তোমার বাবা মা গেছেন।”

“না, চলুন এমনি এদিক ওদিক ঘুরে আসি।”

খানিকক্ষণ একসঙ্গে যেতে যেতে দুজনেরই কথা থেমে গিয়েছিল বুঝি প্রপাতের অশ্রান্ত গর্জ্জনের অলক্ষিত প্রভাবে। নিরবচ্ছিন্ন এই

শব্দ-নির্ঝরের বুঝি একটা নেশা আছে, ধীরে ধীরে সমস্ত মন অভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন এমন কিছু উল্লেখ করবার মত ঘটেনি। অন্ততঃ সুব্রতের দিক থেকে নয়। হয়ত জলের একটি ধারা ডিঙোতে গিয়ে সুব্রত মীরার হাত ধরেছে, হয়ত দুধারের পাথরের স্তূপের মাঝখান দিয়ে যেতে দু'জনের ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে। কিন্তু সে স্পর্শ সুব্রতের মনে সঞ্চিত হয়ে নেই। সুব্রত সেদিন মীরাকে সামান্য একটু আবিষ্কার করেছিল মাত্র, উৎসাহিত হয় নি।

পিক্‌নিকের পরেও অনেকদিন সুব্রত বিন্ধ্যাচলে ছিল। মীরার প্রতি হয়ত আগের চেয়ে সে বেশী একটু মনোযোগ দিয়েছে, হয়ত কোনদিন অভিনয় করেছে একটু বেশী। কিন্তু তার ভেতর সত্যকার ব্যাকুলতা কিছু ছিল না। বিন্ধ্যাচলের স্যানাটোরিয়ামের কল্পনার মতই একদিন তার মন থেকে সব মুছে গেছে। মীরার মনে সে সব দিন যে সযত্নে সঞ্চিত থাকতে পারে একথা সে ভাবেনি। আর একবার পাটনায় কিছুদিন আগে মীরার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, মীরার সঙ্গে ঠিক নয়, তার পরিবারের সঙ্গে। তাকে পৃথক করে দেখবার কথা সেদিনও তার মনে হয়নি। মীরার ব্যবহারে হয়ত সে সেদিন ভেবে দেখবার মত কিছু পেত যদি না তার মন থাকত আত্মনিমগ্ন। কিন্তু তার আত্মার ক্লান্তির তখনই সুচনা হয়েছে।

মীরার পরিবর্তন সে লক্ষ্য করেছে একান্ত নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাবে। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ পার হয়ে মীরা নারীত্বের পরিপূর্ণতার একটি মহিমা লাভ করেছে। তবু সুব্রতের কাছে তা ছিল নিরর্থক। মীরা সেদিন বুঝি সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে একটু ধরা দিয়েছিল। আভাস দিয়েছিল তার হৃদয়ের উদ্বেলতার। কিন্তু সুব্রত সচেতন হবার প্রয়োজন বোধ করেনি। সে বিশ্বাসই করেনি। অনুরাগ আকর্ষণের সাধারণ দৈনন্দিন অভিনয় হিসাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে

গ্রহণ করেছে, মিথ্যা, দুর্বলতার ভান করতেও তার বাধেনি। এই ভানই তার জীবনের মূল পর্যন্ত শুকিয়ে দিয়েছে সে জানে, তবু উপায় ত নেই। ভান করাই এসব ক্ষেত্রে রীতি। তুমিও অভিনয়ে যোগ দেবে এইটুকুই সবাই আশা করে। সুবিধা তার অনেক। সময় কাটে বেশ। বিদায়ের বেলা কিছু দাগ থাকে না মনে; চেনা পাওনা বোঝা পড়ার কোন কোন হিসাব নিকাশও নয়। মন যাদের মরে গেছে তাদের পক্ষে এর চেয়ে সুবিধা আর কি হতে পারে। এ অভিনয়ে অভ্যস্ত বলেই তার ক্লান্ত মন মীরার সংস্পর্শে কোন সাড়া দেয়নি।

তারপর এই সাক্ষাত! সুব্রত এতক্ষণে স্পষ্ট করে গতরাত্রের কথা ভাবতে সাহস করে। মীরা তার কাছে শুধু নূতন করে উদ্‌ঘাটিত হয়নি তাকেও করেছে উন্মোচন, তার নিজের রহস্যকে। শুধু কি নগরের রাত্রির মোহ আর সাক্ষাতের এই আকস্মিকতা তার মনকে বিহ্বল করে তুলেছে এমন করে! তার ভয় হয় সাবানের বুদ্‌বুদের মত এখনি সমস্ত রহস্য যদি যায় মিশিয়ে, রাত্রির সুর দিনের আলোয় যদি যায় কেটে, যদি রাত্রির সেই রহস্যময় মেয়েটিকে আর না খুঁজে পায় মীরার মধ্যে!

অনেক স্থূল সংস্পর্শ ত হয়েছে তার জীবনে, সে আর তা চায় না, তার মন অবসন্ন এই সমস্ত সংস্পর্শেরই ভাবে আর গ্লানিতে, জীবনে তা কিছুই আনে না, শুধু রেখে যায় ক্লান্তির ভার। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে মেঘে সাক্ষাত সে নয়, আকাশ স্পন্দিত হয়ে উঠে না সে সাক্ষাতের উন্মাদনায়—বিদ্যুতের চেয়ে তীব্র। তার চেয়েও সূক্ষ্ম আনন্দের প্রবাহ বয়ে যায় না সত্তা থেকে সত্তায়।

কাল কি এই সাক্ষাৎই হয়েছিল? না তারই মনের ভুল?

কিন্তু সাহস হয় না তার এ ভুল যাচাই করতে। তার চেয়ে এইখানেই পড়ুক যবনিকা এ অধ্যায়ের ওপর, এই রাত্রির রহস্যকে

কাজ নেই দিনের আলোয় টেনে এনে। জড়ত্বের কুয়াসা ক্ষণিকের জন্য তার মন থেকে গিয়েছে কেটে। এইটুকুই যথেষ্ট আর তার লোভ করবার প্রয়োজন নেই।

নাই বা হল আর মীরার সঙ্গে দেখা। জীবনে সব কাহিনী সম্পূর্ণ হয় না। সম্পূর্ণ করতেই হবে এমন কোন কথা নেই। একটি রাত থাকুক তাদের জীবনে অসম্পূর্ণতায় অপরূপ হয়।

একটি অপরূপ রাত, যাতে তার পতিত আত্মা গভীর জড়ত্ব থেকে জেগে উঠেছে, তার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।

দীপ তার জীবনে হয়ত জ্বলবে, কিন্তু একটি থাক তারকা, সুদূর দিগন্তে আয়ত্তের অতীত হয়ে।

রাত্রির এই রহস্য-পরিচয় সে প্রাত্যহিক জীবনের মাঝে টেনে এনে ধূলিমলিন করবে না।

সবে এখন সকাল হয়েছে। মানুষের দুর্ব্বলতারও অন্ত নেই জানি, তবু সুব্রতের এই সঙ্কল্পটুকু জেনেই আমরা বিদায় নিলাম।